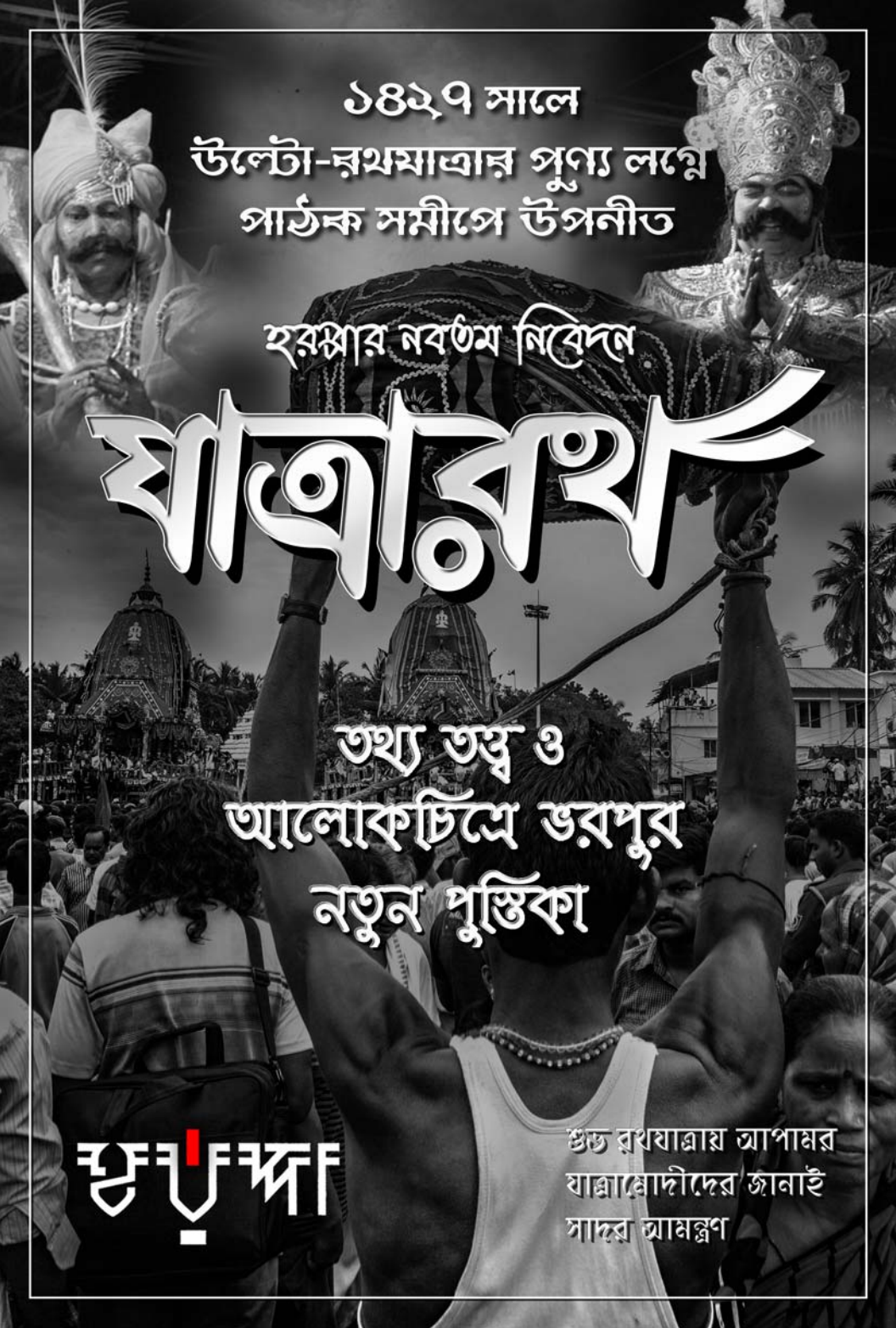
১৪২৭ সালে
উল্টো-রথযাত্রার পুণ্য লগ্নে
পাঠক সমীপে উপনীত
হরপ্পার নবতম নিবেদন
যাত্রারথ
তথ্য তত্ত্ব ও
আলোকচিত্রে ভরপুর
নতুন পুস্তিকা
হরপ্পা
শুভ রথযাত্রায় আপামর
যাত্রাপ্রেমীদের জানাই
সাদর আমন্ত্রণ

করোনার আক্রমণে অন্তরীণ অবস্থায়
১ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে ‘হরপ্পা’-র
বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের সূচনা।
এই ক্রমে ৩০ জুন ২০২০ উল্টোরথে
প্রকাশিত হল আমাদের পঞ্চম প্রয়াস
‘যাত্রারথ’।

তথ্যসংশ্লেষ ও লিখন
সৌম্যদীপ ও সৈকত

প্রচ্ছদ
সৌম্যদীপ

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র
সৈকত মুখার্জি

শিল্পনির্দেশনা
সোমনাথ ঘোষ

সম্পাদক
সৈকত

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও মানুষ ধর্মোৎসবে নৃত্য-গীতাদির সাহায্যে সাধারণের মধ্যে ধর্মমাহাত্ম্য প্রচার করত। দেবদেবীর পুজো উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রার (going in a procession) ব্যবস্থাও হত। দোলযাত্রা, রথযাত্রা, মাঘীসপ্তমীর স্নানযাত্রা, দশহরা স্নানযাত্রা প্রভৃতি আজও এর সাক্ষ্য বহন করছে। এই শোভাযাত্রায় নৃত্য-গীতযোগে দেবমাহাত্ম্য কীর্তিত হত। প্রাচীনকালে এই জঙ্গম উৎসবকে বলা হত যাত্রা। বস্তুত যাত্রা শব্দটি গত্যর্থক। গমনার্থক 'যা' ধাতু থেকে এর উৎপত্তি [যা + ত্র (ভাবে) + আ (স্ত্রীং)]।

বলা হয় ক্রমে সেই নৃত্য-গীতময় দেবমাহাত্ম্য বর্ণনা দেবস্থানের কাছেই দীর্ঘসময় ধরে অনুষ্ঠিত হতে থাকে, এবং লোকে সেখানে এসেই তা শুনতে শুরু করে। এতে পরিক্রমার ব্যাপকতা কিছুটা কমল, নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা ব্যক্তিরাই পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করতেন, কিন্তু ওই নির্দিষ্ট স্থানে নাচ-গানসহ ধর্মানুষ্ঠানও যাত্রা নামেই বিখ্যাত হয়ে রইল। পরবর্তীকালে এইসব ধর্মোৎসবের নৃত্য-গীতানুষ্ঠানের সঙ্গে অভিনয়ের উপাদান সংযোজিত হওয়ায় যাত্রাপালার উদ্ভব হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জের তথাকথিত নিম্নজাতিবর্গের ঐতিহ্য মেনে লৌকিক দেবতাদের যেসব উৎসব হয় তার প্রচলিত নাম 'যাত'। যেমন উলা বীরনগরের 'উলাইচণ্ডীর যাত'। 'যাত্রা' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন লিখেছেন, "যাত্রা শব্দের মূল অর্থ হইতেছে দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা ও উৎসব। আধুনিক কালে 'নদীর যাত', 'মানাদের যাত', এই সব স্থলে মূল অর্থ অনেকটা বজায় আছে। তাহার পর অর্থ হইল, দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে নাটগীত, তাহা হইতে দেবলীলাত্মক অথবা অন্য কাহিনীময় নাটগীতি।" এই 'যাত' শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে বলে অনেকেই মনে করেন। সুতরাং 'যাত্রা' শব্দটিও দ্রাবিড় ভাষা উদ্ভুত হতে পারে। মধ্যযুগে যাত্রাকে দেব-দেবীর প্রতি উৎসর্গীকৃত উৎসব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আমাদের মনে হয় 'যাত' শব্দের পরিবর্তিত রূপ 'যাত্রা' হবার সম্ভাবনা বেশি।

যাত্রা শিল্পের ইতিহাস গ্রন্থে গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ বলেন, "এই সব উৎসবে দেবতার মাহাত্ম্য সূচক কাহিনিতে নাচ-গান-বাজনার

প্রাধান্য ছিল বলেই একে 'নাটগীতি' বলা হত। কৃত্তিবাসী *রামায়ণ*-এর 'উত্তর কাণ্ডে' শিব-দুর্গার বিবাহের যে বর্ণনা আছে তাতে নাটগীতের কথা আছে, আছে তার সঙ্গে 'মঙ্গল'-কাব্যের যোগ।

> নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতুহলে।
> কেহো বেদ পঢ়ে কেহ পঢ়এ মঙ্গলে।।
> নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে।
> পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে।।
>
> (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ৬)"

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে নাটগীতের অনুষ্ঠান হইত বলিয়া ক্রমে নাটগীতকেই যাত্রা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।" (*বাংল্যনাট্য সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৬৯)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য Comedy শব্দটি এসেছে ক্লাসিক্যাল গ্রিক *kōmōidía* থেকে যার দু-টি অংশ হল *κῶμος* (*Kōmos*) মদ্যপানরত শোভাযাত্রা এবং *ᾠδή* (*ōidḗ*) গীত বা গায়ন।

সংস্কৃত *বিশ্বকোষ*-এ যাত্রা সম্পর্কে বলা হয়েছে—যাত্রাতু যাপনোপায়েগতৌ দেবার্চনোৎসবে।

মোটের উপর একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে দেবধর্মোৎসব থেকেই যাত্রার উদ্ভব হয়েছে। বলা হয়ে থাকে এদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকেই যাত্রার প্রচলন ছিল।

দেবী ভগবতীর উদ্দেশে প্রতি মাসে যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হত। এই জাতীয় ষোড়শ প্রকার যাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায় বামকেশ্বর তন্ত্রে, বৈশাখে মঞ্চযাত্রা, চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠে মহাস্নানযাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রা, শ্রাবণে জলযাত্রা, ভাদ্রে ধুননযাত্রা, আশ্বিনে মহাপূজাযাত্রা, কার্তিকে দীপযাত্রা, অগ্রহায়ণে নবান্ন যাত্রা, পৌষে

অঙ্গরাগ যাত্রা, মাঘে মহাদেবীযাত্রা, ফালগুনে দোলযাত্রা, চৈত্রে দূতীযাত্রা, রাসযাত্রা, বাসন্তী যাত্রা ও নীলযাত্রা—এই সকলপ্রকার যাত্রা ভববন্ধন মোচনের উপায় বলা হয়েছে।

স্কন্দ পুরাণেও একটি দীর্ঘ তালিকায় মুক্তিপ্রদায়িনী দ্বাদশ প্রকার যাত্রার উল্লেখ করা হয়েছে—

দ্বাদশৈতাঃ মহাযাত্রা গুণ্ডিকাখ্যাস্তু পাবকাঃ।
একৈকা মুক্তিদা সর্বাঃ ধর্মকামার্থ সাধনাঃ।।

মুক্তিলাভের জন্য প্রতিমাসে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশে যে উৎসব উদ্‌যাপিত হত সেগুলিও যাত্রানামে খ্যাত। ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন *যাত্রাতত্ত্বম্*-এ দ্বাদশ প্রকার যাত্রার উল্লেখ করেছেন,

বৈশাখাদিষু মাসেষু যাত্রাপূজা বিধিংমুনে।
শ্রোতুমিচ্ছামি দেবস্য যথাবদ্বক্তু মর্হসি।।
বৈশাখাদিষু মাসেষু দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
যাযা দ্বাদশযাত্রা সুস্তাস্তা বক্ষ্যামিতে শৃণু।।
বৈশাখে চান্দনী যাত্রা জ্যৈষ্ঠে স্নাপনুপীরিতা।
আষাঢ়ে রথযাত্রাস্যাৎ শ্রাবণে শায়নী তথা।।
ভাদ্রে দক্ষিণ পাশ্বিয়া আশ্বিনে বামপার্শ্বিকা।
উত্থানী কার্ত্তিকেমাসি ছাদনী মার্গশীর্ষকে।।
পৌষে পুষ্যাভিষেকঃ স্যান্মাঘেশাল্যোদনীতথা।
ফাল্গুনে দোলযাত্রাস্যাচ্চৈত্রে মদনভঞ্জিকা।।
একৈকমুক্তিদা সর্বা ধর্মকামার্থ সাধনা।

সেই বারোটি যাত্রা হল: বৈশাখে চন্দনী, জ্যৈষ্ঠে স্নাপনী, আষাঢ়ে রথ, শ্রাবণে শয়নী, ভাদ্রে দক্ষিণ পার্শ্বিয়া, আশ্বিনে বামপার্শ্বিকা, কার্তিকে উত্থানী, অগ্রহায়ণে ছাদনী, পৌষে পুষ্যাভিষেক, মাঘে শাল্যোদনী, ফাল্গুনে দোল ও চৈত্রে মদনভঙ্গিকা।

কিন্তু এগুলির রচনাকালকে যে প্রাচীন বলা যায় না তা বঙ্গ ইতিহাসের কালানুক্রম দেখলেই বোঝা যাবে। ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ ধর্ম ও বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবী আশ্রিত ধর্মানুষ্ঠান বা 'যাত'-এর উপর ব্রাহ্মণ্য অধিকার স্থাপনের জন্য সেগুলিকেও এইসব সংস্কৃত রচনার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন মনসার পৌরাণিক উদ্ভব রচিত হয় মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে।

তবে উৎসব উপলক্ষ্যে অভিনয়ের জন্য নাট্যরচনা-রীতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত। কালপ্রিয়নাথের যাত্রা উপলক্ষ্যে ভবভূতি *উত্তররাম চরিত* ও *মালতীমাধব* নাটকদ্বয় রচনা করেন। কালিদাস *মালবিকাগ্নিমিত্র* ও শ্রীহর্ষ *রত্নাবলী* নাটক বসন্তোৎসবে অভিনয়ের জন্য রচনা করেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি শাস্ত্রানুযায়ী *জয়বিজয় কাহিনী* অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন মহেন্দ্রবিজয়োৎসবে। বাংলায়ও দেব-ধর্মোৎসবে অভিনয় করার জন্যই যাত্রানাট্য রচিত হতে আরম্ভ করে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা প্রকারের যাত্রা প্রচলিত রয়েছে যার ভিত্তি লোকগাথা অবলম্বনে লোকসংস্কৃতি। যেমন—

ওরাওঁ যাত্ : ছোটনাগপুরের আদিবাসী ওরাওঁদের আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল 'ওরাওঁ যাত্'। ওরাওঁদের মধ্যে প্রতিবেশী গ্রামগুলির আদিবাসী যারা তাদের বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন উপলক্ষ্যে অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের নৃত্যানুষ্ঠান যাত (যাত্রা) নামে খ্যাত। এই সামাজিক অনুষ্ঠানে নুতন সাজে সজ্জিত যুবক-যুবতীরা বহু দূর থেকে শোভাযাত্রা করে যাত্রাস্থানে আসে। সমস্ত রাত্রি ধরে তাদের নৃত্যগীত চলে।

যে-গ্রামে যাত্রার অনুষ্ঠান হয় সেই গ্রামের বর্ষীয়সী কয়েকজন মহিলা মঙ্গলকলস (কর্‌সা) মাথায় করিয়া সেইখানে উপস্থিত থাকে। কোনো-কোনো সময় তারাও ওই নৃত্যে যোগদান করে।

জেঠ যাত্রা : একসময় ওরাওঁ যাত্রার চাইতেও বেশি খ্যাতি ছিল 'জেঠ যাত্রা'-র। জ্যৈষ্ঠ মাসে অনুষ্ঠিত হত বলে এর নাম 'জেঠ যাত্রা'। এই যাত্রায় অংশগ্রহণকারী অবিবাহিত মুন্ডা আদিবাসী যুবক-যুবতীরা পরস্পর পরিচিত হত। যে-জায়গাটিতে এই অনুষ্ঠান হত তাকে বলা হতো 'যাত্রা টাঁড়'। এই উৎসব ক্ষেত্রে একটি কাঠের খুঁটি পুঁতে রাখা হত, যাকে ঘিরে ফুলসাজে সজ্জিত যুবক-যুবতীরা নাচগান করত। সেই খুঁটিটির নাম ছিল 'যাত্রা খুঁটিয়া' । জেঠ যাত্রা ছাড়াও মুন্ডাদের মধ্যে 'কাতিক যাত্রা' প্রচলিত আছে, সেটিও নাচ গানের মাধ্যমেই পালিত হয়। অসুর উপজাতির মধ্যেও জেঠ যাত্রা-র প্রচলন আছে।

যাত্রা পরব: মাঘমাসে সাঁওতাল পরগনার সাঁওতালদের একটি পরব হয় যার নাম যাত্রা পরব। যদিও মনে করা হয় এটা ভুইঞাদের প্রভাবে হয়েছে। নাচ গান মেলা এর বৈশিষ্ট্য।

মারি যাত্রা : 'মারি যাত্রা'র ব্যাপক প্রচলন আছে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের মধ্যে বিশেষ করে তামিলনাড়ু ও কর্নাটকের গ্রামের আরাধ্য দেবীর নাম 'দেবী মারি' বা 'মারি-আম্মা'। এই দেবীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠানকে 'মারি যাত্রা' বলে। যেখানে লৌকিক 'মারি-পাট্টু' গীত ও 'মুলাইকট্টু' নৃত্য করা হয়। এই অনুষ্ঠান এগারো দিন ধরে চলে। মনে করা হয়, 'মারি-আম্মা'-র আঞ্চলিক রূপ বাঙালির লৌকিক দেবী শীতলা এবং মনসা। মনসা ও শীতলার গান বাংলার লোকসংস্কৃতিতে

গুরুত্বপূর্ন স্থান অধিকার করে আছে, মঙ্গলকাব্যের সূত্র ধরে তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক ব্যাপক অধ্যায়। যা আধুনিক যাত্রার পূর্বসূরি। মাদ্রাজের সমুদ্রকূলের নিরক্ষর মৎসজীবীরা নিত্য যে-পূজা-অনুষ্ঠান করে থাকে তাকে তারা 'যাত্রে' বলে।

সাহি যাত্রা : ওড়িশায় প্রচলিত আছে সাহি যাত্রা। সাহি শব্দের অর্থ মোটামুটিভাবে পাড়া—যে প্রাচীন পাড়াগুলিতে জগন্নাথ মন্দিরকে রক্ষা করবার জন্য যুবকদের নিয়ে ব্যায়ামাগার তৈরি করা হয়েছিল। সবচেয়ে পুরোনো নয়টি সাহি আছে। সেখানে একটি করে হনুমান মন্দির আছে, আছে ব্যায়ামাগার ও তৎসংলগ্ন পুকুর। সাহি যাত্রায় এইসব সাহি থেকে শোভাযাত্রা বের হয়, যেখানে বড়ো-বড়ো মুখোশ, জমকালো পোশাক, তির-ধনুক, ঢাল-তলোয়ার হাতি-ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতির মতো বেরিয়ে রাস্তায় কসরত দেখানো হয়। কালী দুর্গা রাম রাবণ ইত্যাদি সেজে যে দৃশ্যগুলি নৃত্যাভিনয় করা হয় সেগুলো অধিকাংশই যুদ্ধ দৃশ্য।

ইতিহাসে ফিরলে দেখা যাবে সম্রাট অশোক খ্রি. পূ. তৃতীয় শতাব্দীতে তাঁর অষ্টম শিলালিপিতে উৎসব অর্থে যাত্রা ব্যবহার করেছেন। তিনি যা লিখেছেন তা থেকে জানতে পারি, পূর্ববর্তীকালের রাজারা 'বিহার যাত্রা' করতেন। সম্রাট অশোকের অভিষেকের দশমবর্ষে তার 'ধর্মযাত্রা', যাত্রার উৎসস্থল হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

মহাভারত-এ আশ্রমবাসিক পর্বে ধৃতরাষ্ট্রের 'বিহার যাত্রায়' 'সঙ্গীত', 'কৌতুক', 'সুখাদ্য' ইত্যাদি ছিল, যা যাত্রার আদি পরিচয়ই বহন করে। এই *মহাভারত*-এই আছে 'ঘোষযাত্রা'-র কথা।

হরিবংশ-এ আছে 'বন-যাত্রা'র কথা। আমরা এখন যাকে 'বনভোজন' বলি, মূলতঃ তাই হল অতীতের 'বন-যাত্রা'। এই 'বন-যাত্রা' বা বনভোজনের একটা বড়ো অঙ্গ ছিল নৃত্য-গীত। তার সঙ্গে নাকি এক রকম অভিনয়ও ছিল, যা-তে তুলে ধরা হত ধর্ম সম্বন্ধীয় ও পৌরাণিক বিষয়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে : "যঃ প্রেক্ষা প্রেক্ষতে, যাত্রা-বিহারে রমতে"—এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, বিহার যাত্রায় রাজা রীতিমত নাট্যানুষ্ঠান (প্রেক্ষা) উপভোগ করতেন।

সম্রাট অশোকের 'ধর্মযাত্রা', হংসনারায়ন ভট্টাচার্যের মতে, অশোকের ধর্মযাত্রা কেবলমাত্র তীর্থযাত্রা নয়। এর মূল উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ শ্রমণগণকে দর্শন দান, স্থবিকগণকে দর্শন ও স্বর্ণদান, জনপদ (দেশ) ও জনগণকে দর্শন, তাঁদের প্রতি ধর্মীয় উপদেশ এবং ধর্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা। সুতরাং সম্রাট অশোকের এই 'ধর্মযাত্রা' একরকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উৎসব হিসেবে চিহ্নিত ছিল।

সমাজ বিজ্ঞানী William Graham Sumner-এর *Folkways : Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs Mores, and Morals* গ্রন্থের শুরুতেই পাওয়া যাবে, "The folkways, therefore, are not creations of human purpose and wit. They are like products of natural forces which men unconsciously set in operation, or they are like the instinctive ways of animals, which are developed out of experience, which reach a final form of maximum adaptation to an interest, which are

handed down by tradition and admit of no exception or variation, yet change to meet new conditions, still within the same limited methods, and without rational reflection or purpose. From this it results that all the life of human beings, in all ages and stages of culture, is primarily controlled by a vast mass of folkways handed down from the earliest existence of the race, having the nature of the ways of other animals, only the top-most layers of which are subject to change and control, and have been somewhat modified by human philosophy, ethics, and religion, or by other acts of intelligent reflection." (p 4)

এই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, গ্রন্থের লেখক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য যা বলেছেন তার মর্মার্থ এই যে—মানব সমাজের আদিমতম স্তরে যে লোকমানসিকতা ও আচার অনুষ্ঠান দেখা দিয়েছিল তা সমস্ত যুগের ও সমস্ত সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে 'লোক'-সহ সমস্ত মানুষের মানসিকতা ও আচারবিচারের ভিতর অলক্ষিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে লোক মানসিকতার অস্তিত্ব শুধু তথাকথিত গ্রাম্য বা লোকশ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যাঁরা উন্নত কৃষ্টির অধিকারী, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, ধর্মদর্শন প্রভৃতি চর্চার ফলে যাঁরা শিষ্ট শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন—যাঁরা নাগরিক, তাঁদের মধ্যেও লোক মানসিকতা ও আচারবিচার প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে চলেছে।

লোক-শব্দটির আভিধানিক যে অর্থ সেই সাধারণ ব্যক্তি অর্থে এর প্রয়োগ বন্ধ হয়েছে বহুকাল। 'লোক-সংস্কৃতি' শব্দের মধ্যেও 'লোক'-শব্দ দ্বারা সাধারণভাবে সংকীর্ণ অর্থে নাগরিক শিক্ষা-সংস্কৃতি বহির্ভূত অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত, বিশ্বাস-প্রবণ, প্রাচীন সংস্কার ও প্রথা চালিত মানুষের একটি পর্যায়কে বোঝান হয়। একসময় সমস্ত মানুষ 'লোক'-পর্যায়ভুক্ত ছিল, যেখানে সকলেই লোক সেখানে 'লোক' বলে বিশেষ কিছু থাকার কথা নয়। এই 'লোক' কথাটা একটা ভেদের তাৎপর্য বহন করে, সমাজের নিম্নস্তরের প্রতি উচ্চস্তরের সামাজিকদের বিশেষ মনোভাব থেকেই এর উদ্ভব। সমাজবিবর্তনের এক বিশেষ পর্যায়ে জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশকে আর এক অংশ যেদিন 'লোক' বলে চিহ্নিত করেছিল সেদিন 'লোক'-এর আগে আরেকটি শব্দ অনুচ্চারিত ছিল, সেটি হল 'ছোটো'। শুনতে যতই খারাপ লাগুক ওই অনুচ্চারিত ধারণা নিয়েই অধিকাংশ লোক-সংস্কৃতি গবেষক কাজ করে গেছেন। তাঁদের লিখনের ছাপার অক্ষরে দুই পংক্তির মাঝে শূন্যস্থানে সে অপরের নমুনা ধরা আছে, খেয়াল করলেই নজরে পড়বে ভাষার বিন্যাসে।

"সমাজবিবর্তনের সঙ্গে ঐ বিশেষ অংশের পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও আজও একটা অংশকে আর একটা অংশ লোক বলিয়া চিহ্নিত করিয়া থাকে। সুতরাং এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক, কোন বৈশেষিক লক্ষণের জন্য জনগোষ্ঠীর এক অংশ অন্য অংশকে লোক বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। একথা সত্য যে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে নাগর সভ্যতার উদ্ভব হওয়ায় নাগরিক জীবনের ও গ্রাম্য জীবনের পার্থক্যের ভিত্তিতে নাগরিক মানসিকতায় ও

গ্রাম্য মানসিকতায়, আচারে-বিচারে তথা সংস্কৃতিতে পার্থক্য দেখা দেয়। নাগরিকরা গ্রামের সব কিছুকেই গ্রাম্য আখ্যা দিয়া উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিতে থাকেন; শিক্ষিতরা আবার নিজেদের শিষ্ট এবং নিজেদের আচারকে শিষ্টাচার বলিয়া গণ্য করিয়া অশিক্ষিতদের অশিষ্ট ও তাহাদের আচারকে অশিষ্টাচার বলিয়া অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে নাগরিক ও শিষ্ট সমার্থক হইয়া দাঁড়াইবার ফলে নাগরিক আচারই শিষ্টাচার বলিয়া স্বীকৃত হয়; এবং গ্রাম্য ও অশিষ্ট সমার্থক হইয়া পড়ায় গ্রাম্য ও অশিষ্ট জনগোষ্ঠীই নাগরিক শিষ্টদের কাছে 'লোক' আখ্যা পায়"। (*বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা* গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, পৃ. ২)

আজও অবস্থাটা প্রায় একরকম, যদিও সাব-অল্টার্ন শব্দটি যুক্ত হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক শব্দ-প্রয়োগে, তাকে নকলের অপপ্রয়োগও কাহিনি বা কাহিনিচিত্রের বাক্যাংশে দেখা যায় কিন্তু মনোভাবের বদল ঘটেনি। আমরা এর সঙ্গে যুক্ত করব— যে নাগরিক আচারের কথা বলা হচ্ছে, সে নগর মহানগর নয়, মহানগরের কোনো বিশিষ্ট শিষ্টাচার বা সংস্কৃতি থাকা তার গঠনের ফলেই সম্ভব নয়। যেমন তিলোত্তমার বাহান্ন শতাংশ মানুষ বস্তিবাসী, পঞ্চাশ শতাংশ ভিন্নভাষী। উচ্চসমাজ গালি-ও দেয় বি-ভাষায়। তাই নাগরিক হিসাব থেকে মহানগরকে বাদ দিতে হবে। মহানগরে অন্যান্য সকল উৎপাদিত মালের মতোই সংস্কৃতির বড়োবাজার রয়েছে মাত্র। কাঁচামাল আজও কৃষিক্ষেত্রোৎপন্ন বা কৃষ্টি-বাহিত। আর মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষে প্রকৃত নাগরিক সভ্যতা প্রায় পাঁচ-হাজার বছরের পুরোনো, তাই পূর্বকথিত 'নাগরিক ও গ্রাম্য' বিচার নেহাতই ঔপনিবেশিক উদ্‌গার। যার

উদ্‌গীরণ শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের অজ-পাড়া-গাঁ মহানগরে। ভয়ংকরতম অল্পবিদ্যায় মহানাগরিক একাংশ দেশীয় সংস্কৃতির সমস্ত উত্তরাধিকারকেই খড়্গহস্ত উন্নয়ন দ্বারা 'উন্নততর' শ্লীল-সংস্কৃত করে তুলছিলেন, এবং নথিভুক্ত করছিলেন। সেখানে যদিওবা অধিকাংশের বা লোক-এর রক্ষে ছিল, পরবর্তী শতকের ইতিহাসকারেরা সেসব ঢপবাজিকে আপ্তবাক্য ধরে এমন ইন্দ্র-জাল বিস্তার করলেন তা-তে বাঁধা পড়ে গেল সকল শিক্ষা, নাগরিক-গ্রাম্য নির্বিশেষে সকলে সে বন্ধকি কারবারের অধমর্ণ আজকের বিশ্বগ্রাম্য সমাজে। কাজের কাজ যা হোল— হাজার বছর পেরিয়েও একই 'লোক'-কুসংস্কার দশ হাজার বছর আগেকার মহা-উন্নত বিজ্ঞানের গল্প হিসাবে বড়োমুখ করে বড়োমানুষেরা বড়ো-বড়ো মঞ্চে বলে চলতে পারে নির্দ্বিধায়, আধুনিকতম বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ফসল সমাজ-মাধ্যম ভাসিয়ে দিতে পারে গব্য মল-মুত্রে! আর পোড়োরা থরহরি কম্পমান, আগামী ভোটের আগে অরাজনৈতিক ভদ্দরলোক মুখোস বাঁচাতে অথবা সুশীল বামপন্থী লাচার সাত-শতাংশ সেজে বালিতে মুখ গুঁজতে ব্যস্ত, যে পোড়ার মুখে এখনও মিচকে হাসি আসে অন্যের পশ্চাদ্ভাগ মারা যাচ্ছে সেই খুশিতে। গৃহবন্দি শিষ্ট বাঙালি বউ-বর-বাচ্চা সহযোগে স্থানীয় সংস্থার ফেসবুক লাইভে নৃত্য-গীত-সংলাপে সংস্কৃতির বন্যা বইয়ে চলেছে, কী আনন্দ আকাশে বাতাসে! 'লোক-সংস্কৃতি' ক্ষেত্রসমীক্ষার একমাত্র ক্ষেত্র বোধহয় এখন হওয়া উচিৎ 'সোশ্যাল মিডিয়া', 'সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং মেনটেইন' করে সেই হবে আসলি গবেষণা। ব্যঙ্গ-বর্জিতভাবে বললে মোদ্দা কথা দাঁড়ায়, প্রত্নক্ষেত্রে যেমন উপরের ঢিবি দেখে

খনন করে মেলে পূর্ব ইতিহাস, তেমনি সমাজ ইতিহাস পেতে গেলে বর্তমান সামাজিক আচারের ঢিবি খুঁড়েই পেতে হবে তাকে, তুলনামূলক আলোচনা করতে হবে বর্তমানের সমাজ মানসিকতাকে ধরেই, আমরা অনেক এগিয়ে গেছি, তারা অনেক পিছিয়ে ছিল, এইরকম নির্বুদ্ধিতার বশবর্তী হওয়া চলবে না।

যাত্রা বিষয়ে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা হয় ১৮৮২-এ সুইজ্যারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে। গবেষক নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯১০) 'Yatras or The Popular Dramas of Bengal' শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। সেখানে যাত্রার প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত ছিল, একাদশ শতাব্দী থেকে রাধা-কৃষ্ণলীলার উদ্ভব হয়। এই রাধা-কৃষ্ণলীলাই দ্বাদশ শতকে জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-এ রূপায়িত হয় কাব্য-সংগীত-অভিনয়গুণ ধারণ করে। *গীতগোবিন্দ*-র আঙ্গিক নিয়ে পণ্ডিতদের নানান অভিমত রয়েছে। তবে এই *গীতগোবিন্দ* যে যাত্রা ছাড়া আর কিছুই নয়, সেই অভিমত ব্যক্ত করেন ডক্টর নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর গবেষণাপত্রে তিনি বলেন, "The well-known Sanskrit Idyll called *Gita-gobinda*, by Jayadeva Goswami, which, as has been well observed, is nothing but a Yatra in Sanskrit, is based on a part of the story, in as much as it depicts only the amours of Krishna with Radha in their various phases without referring to the other two periods of his life." (p. 3) —এই অভিমত বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-কে যাত্রা ছাড়া আর কিছু মনে করতে চাননি। পরবর্তীকালে অনেকেই এবিষয়ে

সহমত পোষণ করেছেন, কিন্তু তাঁর গবেষণা যাত্রার ইতিহাস বিষয়ক নয়, তিনটি যাত্রার কাহিনির পর্যালোচনা। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১২৮৯ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় (ইং ১৮৮৩) এই পুস্তকের আলোচনা প্রসঙ্গে 'যাত্রার ইতিবৃত্ত' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে দেখা যায় আমাদের দেশে কৃষ্ণযাত্রার আগে শক্তি বিষয়ক যাত্রা প্রচলিত ছিল বলে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মনে করতেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

"ইউরোপে যে অবস্থায় মিষ্টরিজ (Mysteries) আরম্ভ হইয়াছিল, বাঙ্গালায় সেই অবস্থায় যাত্রা আরম্ভ হয়। সে কত দিনের কথা, তাহা আমরা এক্ষণে নিশ্চয় করিয়া বলিতে প্রস্তুত নহি। শুনিতে পাওয়া যায়, চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যাত্রা ছিল, সে যাত্রা কেবল শক্তিবিষয়ক, কৃষ্ণযাত্রা তখন একেবারে হইত না। [...] শক্তিযাত্রার স্বতন্ত্র নাম ছিল না। অন্য কোন যাত্রা না থাকায়, বোধহয়, স্বতন্ত্র নামের প্রয়োজন হয় নাই। পরে যখন কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ হইল, তখন সে প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। কালীয় দমন যাত্রায় সাধারণতঃ লোকের মনোরঞ্জন হইয়াছিল, সে নাম লোকের অভ্যাস পাইয়াছিল, সুতরাং লোকে কৃষ্ণযাত্রাকে সেই নামে অভিহিত করিল। তাহার পর যখন কালীয়দমন ছাড়িয়া কৃষ্ণযাত্রার অন্য পালা আরম্ভ হইল, লোকে তখনও সেই কালীয়দমন নাম ব্যবহার করিতে লাগিল। কালীয়দমন কৃষ্ণযাত্রা, সুতরাং তাহারা বুঝিল কৃষ্ণযাত্রা মাত্রেই কালীয়দমন। দান হোক, মান হৌক, মাথুর হোক, যে পালাই হোক, লোকে সকল পালাকেই কালীয়দমন বলিতে লাগিল। অদ্যাপি অনেকেই এই নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন।" (পৃ ৫০৫-৫০৬)

আমাদেরও তাই মনে হয় মঙ্গলকাব্য পাঠের মধ্যে অথবা তারও পূর্বের কাহিনি বা কথা বিশেষ নৃত্য-গীত, সুরেলা সংলাপ, সাজগোজ বা সঙ সহযোগে যাত্রার আদিরূপ 'যাত' হিসাবে প্রচলিত ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র, "শক্তিযাত্রার স্বতন্ত্র নাম ছিল না। অন্য কোন যাত্রা না থাকায়, বোধহয়, স্বতন্ত্র নামের প্রয়োজন হয় নাই" বলতে এই 'যাত'-এর কথাই বোঝাতে চেয়েছেন হয়তো।

গবেষক নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় 'Yatras or The Popular Dramas of Bengal'-এ আরও বলেন, "That such festivals and such representations must have taken place at a very early date in India there are many important evidences to attest. In the biography of two immediate disciples of Buddha's— of Maudgalayana and of Upatishya— we read of their "meeting at the occasion of a festival at Rdjagriha, their behaviour during the several exhibitions of spectacles, their mutual addresses when the shows are over."[1] Now, if we accept with Burnouf, Lassen and other eminent antiquarians the date of Buddha's death as it is given by the Ceylonese era, 543 B.C., we are carried back at once to the 6th century before Christ when Maudgalayana and Upatishya lived and attended the festival and the spectacles alluded to above. Nay, we can go a step still further, for, in the Lalita-visitara, Siddhartha is examined along with the other arts and sciences also

in the Natya, that is to say in the dramatical art, in which he shows an equal skill and perfection.[2] (p 45)

1. Csoma Korosi's Analysis of the Dulva in the As. Res. XX., p. 50; von H. C. Lassen Indische Alterthumskunde II., 502; A. Weber, Indische Litteratur Geschichte, s. 216.

2. Foucaux, p. 150 ; Weber, Ind. litt. Gesch, s. 217.

অর্থাৎ "বস্তুত এই ধরনের উৎসব ভারতবর্ষে যে বেশ সুপ্রাচীনকাল থেকেই পালিত হতো, তার বহু প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়। বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক দুই শিষ্য মৌদগল্যন ও উপতিষ্যের আত্মজীবনীতে দেখি তাঁরা প্রায়ই রাজগৃহের উৎসব উপলক্ষে মিলিত হতেন পরস্পরের সঙ্গে। বার্লফ, লাসেন প্রমুখ বিশিষ্ট প্রত্নবিদ বুদ্ধের মৃত্যুর তথা মহানির্বাণের যে সময় ধার্য করেছেন (৫৪৩ খ্রিস্টপূর্ব) তা-তে করে মৌদগল্যন ও উপতিষ্যের এই ভাষ্য খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের বলে গণ্য করা যেতে পারে। আরো একধাপ এগিয়ে গেলে দেখি 'ললিতবিস্তার'-এ সিদ্ধার্থের নাট্য-অভিনয়-কুশলতার কথা বলা হয়েছে।"

এভাবে ধাপে-ধাপে এগোতে এগোতে তিনি দাবি করে বসেছেন, "All this I think leaves no doubt whatever that Krishna-Yatras were very frequently acted at least in the second century before Christ and were in high popularity with all classes of the Indian society." (p 47)

কৃষ্ণযাত্রাকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে নিয়ে যাওয়া বঙ্গদেশের ইতিহাসের পক্ষে একান্তই বাড়াবাড়ি। বাংলার 'কৃষ্ণযাত্রা'র

প্রসঙ্গে আসার আগে এক্ষেত্রে দুটি তথ্য উল্লেখযোগ্য মনে হয়—

চীনের পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন ৩৯৯ সাধারণ অব্দে, তিনি তাঁর যাত্রাপথে মধ্য এশিয়ার খোটানে (বর্তমানে চীনের পশ্চিমাঞ্চলের একটি প্রদেশ, বর্তমান নাম হোটান) একটি রথযাত্রা দেখেন। বিবরণে তিনি লেখেন—মূল শহর থেকে তিন-চার লি বয়া দেড়-দুই কিলোমিটার দূরে একটি চার চাকার রথ নিয়ে আসেন নগরবাসীরা। তিরিশ হাত উঁচু সেই রথ। রথের মাঝে মূল বিগ্রহকে বসানো হয়, এবং তার দুই দিকে বসানো হয় দুই বোধিসত্ত্বকে।

রথযাত্রা শুনলেই যে পুরীর জগন্নাথদেবের রথের কথাই আমাদের মাথায় আসে সেই পুরীর মন্দিরের সাথে বৌদ্ধ যোগের কথাও আছে। ফার্গুসনের মতে, পুরীই হয়তো বৌদ্ধশাস্ত্রের সেই 'দন্তপুর', যেখানে কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত সাধারণ অব্দের পঞ্চম শতকে তথাগতের শ্ব-দন্তের ওপর একটি মন্দির নির্মাণ করান। এই তত্ত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে নানান যুক্তি বর্তমান। আবার বলা হয়, এখান থেকেই সেই শ্ব-দন্ত সাগর পেরিয়ে সিংহলে যায় এবং তা নিয়ে সিংহলে (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রথযাত্রা করেন।

বৈদিক যুগে এক ধরণের গীতিনাট্যের অস্তিত্ব ছিল বলে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা মনে করেছিলেন। তাঁদের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, আজকের যাত্রা সেই বৈদিক যুগের যাত্রা বা নাটকের দ্বারা প্রভাবিত। এবং এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বহন করেছে জয়দেবের গীতগোবিন্দ। কিন্তু বাংলা যাত্রায় বৈদিক যাত্রা শৈলীর প্রভাব নেই বলেই মনে করা হয়।

বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা গ্রন্থে বৈদ্যনাথ শীল বলেছেন, "জয়দেবের কাব্য-শৈলীর বৈদিক বংশধরত্ব প্রমাণ করিবার মতো উপায় আমাদের নাই। সুতরাং বাংলা যাত্রার শৈলীও বৈদিক নয়।" তাঁকে অনুসরণ করে দেখানো যায়, বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যা-পদগুলির মধ্যে 'বুদ্ধ নাটক' শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে— নাচন্তি শবর গায়ন্তি দেঈ।

বুদ্ধ-নাটক বিষমা হোঈ।।

বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ 'নাট' শব্দটি আছে, যমুনার ঘাটে গোপীদের দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে নাট পাতিলেন, তাহার বর্ণনা এই রকম:

ষোল শত গোপী গেলা যমুনার ঘাটে।
তা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাতিল নাটে।।
খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ।
তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ।।

—*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, বংশী খণ্ড, ১ম পদ

বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্য-ভাগবত* গ্রন্থে ডাকের গানের বর্ণনা পাওয়া যায়—

একদিন এক বড়লোকের মন্দিরে।
সর্পক্ষত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে।।
মৃদঙ্গ মন্দিরা গীত—তার মন্ত্রঘোরে।
ডঙ্ক বেড়ি সভেই গায়েন উচ্চস্বরে ।।
... ...
কালিদহে করিলেন যে নৃত্য ঈশ্বরে।
সেইরূপ গায়েন কারুণ্য উচ্চস্বরে।।

—*চৈতন্য-ভাগবত*, আদি, ১১শ অধ্যায়

চৈতন্যভাগবত-কার কৃষ্ণযাত্রা শব্দের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই কৃষ্ণযাত্রার উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ কেউ জানে না—

কৃষ্ণ-যাত্রা অহোরাত্র কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
ইহার উদ্দেশো নাহি জানে কোনো জন।।

—চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৪র্থ অধ্যায়

দানখণ্ড গানের উল্লেখ পাওয়া যায় *চৈতন্যভাগবত*-এ—

দানখণ্ড গাহেন মাধবানন্দ ঘোষ।
... ...
সুকৃতি শ্রীগদাধর দাস করি সঙ্গে।
দানখণ্ড নৃত্য প্রভু করে নিজ রঙ্গে।।

—চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৫ম অধ্যায়

চৈতন্যদেব নিজে অভিনয় করেছিলেন— "আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধানে।"

চৈতন্যদেবের এই অঙ্কবদ্ধ নৃত্য কী ছিল তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন। গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ বলেছেন, "নাটক বা যাত্রার যে অংক ভাগ তার ইংগিতও ছিল চৈতন্যর নাট্যলীলায়। যাত্রার মতই এই নাট্যলীলায় কীর্তন ও গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা ছিল। হরিদাস স্বয়ং নাট্যলীলার উপস্থাপনা বা মুখবন্ধ করেছিলেন। আজকের যাত্রার 'প্রস্তাবনা' অংশ তারই ভাবাদর্শে চলমান। চৈতনানাট্যলীলায় শ্রীনিবাস নিয়েছিলেন 'নারদ' ভূমিকা। যে চরিত্রটি বার বার চৈতন্যের অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং চৈতন্যের দার্শনিকতাকে স্পষ্ট করে তোলে। সেদিনকার সেই শ্রীনিবাস রূপায়িত নারদ, পববর্তী যাত্রার মহান্ত, দূতী, পৌর্নমাসী বা আরও আধুনিক যাত্রার 'উচিত', 'বিবেক', 'পাগল' ইত্যাদি চরিত্রগুলির আদিপুরুষ। চৈতন্য নাট্যলীলায় 'সংলাপ' ছিল,

আজকের যাত্রায় সেই সংলাপেরই প্রাধান্য। আজকের যাত্রায় যেমন অধিকারী, সেদিনের অদ্বৈতাচার্যের ভূমিকাও ছিল তাই। অষ্টাদশ, ঊনবিংশ শতাব্দীর যাত্রায় চৈতন্য নাট্যলীলার যথেষ্ট প্রভাব আছে তা প্রমাণিত হয়।" (*যাত্রা শিল্পের ইতিহাস*, পৃ ২২)

বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা নামক গ্রন্থে বৈদ্যনাথ শীল চৈতন্যদেবের অভিনয়ের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন—"(১) প্রাচীন যাত্রার মতো ইহা প্রকাশ্য অভিনয় নহে। শ্রীচৈতন্যদেব প্রকৃতিবেশে নৃত্য করিলে যে যে ব্যক্তি সংযত হইয়া তাহা দর্শন করিতে পারিবেন, তাঁরাই শুধু বাড়ির ভিতর অভিনয় দেখিতে অনুমতি পাইবেন।—

"প্রকৃতি স্বরূপে নৃত্য হইব আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার।।
সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
যেইজন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে।।"

(২) নাট্যাভিনয়ের জন্য যে সাজ-পোশাক প্রয়োজন, তাহার যথাযোগ্য আয়োজন করিলেন সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খান। চৈতন্যদেব তাহাকে আদেশ করিয়াছিলেন,"শঙ্খ, কঁচুলি, পাটশাড়ী, অলঙ্কার। যোগ্য যোগ্য করি সজ্জা কর সভাকার।।" সাজ-পোশাক তৈয়ারী হইলে অভিনয় আরম্ভ হইল। (৩) প্রথমে মুকুন্দ কীর্তনের শুভারম্ভ করিলেন। (৪) তারপর পালার মুখ বা স্থাপনা করেন প্রভু হরিদাস। তিনি দুই মহাগোপ শোভিত হইয়া দণ্ডহস্তে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। তিনি জানাইয়া গেলেন, জগৎপ্রাণ চৈতন্যদেব লক্ষ্মীর বেশে নৃত্য করিবেন। তিনি বৈকুণ্ঠের কোটাল, সবাইকে সাবধান করিতে আসিয়াছেন।

তারপর শ্রীবাস পণ্ডিত নারদের বেশে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত তাঁহাকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? এখানে কেমন করিয়া আসিলে?" নারদ আপন পরিচয় দিয়া বলিলেন (৫) শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া নদীয়ায় প্রকট হইয়াছেন, আজ তিনি রুক্মিণীবেশে নাচিবেন। নারদ তাই নৃত্য দেখিবার জন্য সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট রুক্মিণীর যে পত্র ভাগবতে সপ্ত শ্লোকে বর্ণিত আছে চৈতন্যদেব ওদিকে ভাবাবেশে (৬) গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া তাহা পাঠ করিতেছেন। এইভাবে প্রথম প্রহর অতীত হইল। দ্বিতীয় প্রহরে রুক্মিণীবেশে গদাধরের, সুপ্রভাত সখীর বেশে ব্রহ্মানন্দের ও বড়াই-বেশে নিত্যানন্দের প্রবেশ। "নগর-কোটাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কোথায় যাইবে? কি তোমাদের পরিচয়?" সে কথার উত্তর দিতে সখী সুপ্রভাত রাজী হইল না, শুধু জানা গেল তাহারা মথুরা যাইবে। এইভাবে একটু (৭) কথাবার্তার পর অদ্বৈতাচার্য বলিলেন,—

"নৃত্য-গীত-প্রিয় বড় আমার ঠাকুর।
এথায়ে নাচহ ধন পাইবে প্রচুর।।"

গদাধর রমাবেশে নাচিতে লাগিলেন, অনুচর (৮) সময়োচিত গীত গাহিতে লাগিল।—বোধহয় অঙ্কবদ্ধ নৃত্যের একটি অঙ্কের শেষ হইল। তারপর লক্ষ্মীর বেশে চৈতন্যদেব এবং বড়াই-বেশে নিত্যানন্দ প্রবেশ করিলেন। তখন,—

"জগৎজননী ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর।।"

ইহার পর আর অভিনয় অগ্রসর হইল না। মহাপ্রভু মহাভাবের আবেশে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।" (শীল, পৃ. ৪১-৪২)

উপরে-উদ্ধৃত বর্ণনা থেকে তিনি উক্ত অভিনয়ের শৈলী নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন।

১। দশ রূপক-নির্দিষ্ট আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক, ও আহার্য এই চতুর্বিধ অভিনয় সপরিকর চৈতন্যদেব করেছিলেন।

২। যাত্রার মতোই এই অভিনয়ে কীর্তন বা গৌরচন্দ্রিকার বর্ণনা আছে।

৩। হরিদাস পালার স্থাপনা বা মুখবন্ধ করেন,—সুতরাং যাত্রার মতও এর মধ্যে প্রস্তাবনা আছে।

৪। শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বের ব্যাখ্যা বা দার্শনিকতা পাওয়া যায় নিবাস পণ্ডিতের নারদের ভূমিকায়। যাত্রার মহান্ত, দূতী, পৌর্ণমাসী বা আধুনিক যাত্রার উচিত, বিবেক কিংবা পাগল প্রভৃতির আদিপুরুষ হিসাবে আমরা শ্রীনিবাসের এই ভূমিকাটিকে গ্রহণ করতে পারি। ইনিও সংসার-ত্যাগী ব্রহ্মচারী, মহাজ্ঞানী, সন্ন্যাসী নারদ।

৫। যাত্রায়ও সংস্কৃত নাটকের মতো একই অংকে বহু সংযোগস্থল আছে। নগর-কোটাল, গোপী প্রভৃতিরা রাস্তায়, রুক্মিণী গৃহাভ্যন্তরে যুগপৎ অভিনয় করে।

৬। কিছু সংলাপ আছে। গদ্যে কি পদ্যে তার উল্লেখ নেই। সংলাপ যাত্রায়ও আছে।

৭। যাত্রার অধিকারীর বা পালার নিয়ামক ভূমিকার কাজ করেন অদ্বৈতাচার্য। তিনি সংলাপে জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে নারদকে দার্শনিকতার সুযোগ করে দেন। তিনিই রুক্মিণী এবং সুপ্রভাতকে নাচতে আদেশ করেন।

চৈতন্যদেবের অভিনয়টি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের যাত্রার পূর্ব-রূপ বলে ধরে নেওয়া যায়, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন তার উৎপত্তি বিষয়ে।

"চৈতন্যদেবের অভিনয়টি কোন্ ভাষায়, সংস্কৃতে কি বাংলায়, কোন্ পালা অবলম্বনে হইয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু সংস্কৃতে যে নয় তাহা অনুমান করিতে পারি। কেননা সংস্কৃত নাটকের কোথায়ও এমন নির্দেশ নাই যে রঙ্গমঞ্চে পাত্র পাত্রী নৃত্য করিবে এবং অনুচরগণ সময়োচিত গান করিবে।" (শীল, পৃ ৪৩)

এছাড়া চৈতন্যদেবের তৎকালীন কর্মপদ্ধতি আধুনিক বিচারে দেখলে একথা সহজেই অনুমেয় যে কোনও বামুনে ছোঁয়াচের গল্প থাকলে চৈতন্য 'যাত্রা' বিষয়টিকে কখনই মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতেন না, তাঁর কৃষ্ণপ্রেম প্রচার সর্বজন সর্বলোকের জন্য; তাই প্রবল অবিসংবাদী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নিমাই যাবতীয় সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে অবহিত নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু মাধ্যম হিসাবে যে সেটিকে বর্জন করবেন সেটাই স্বাভাবিক, যেমন বুদ্ধদেব তাঁর উপদেশ পালি ভাষাতেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। আমাদের দেশে বুদ্ধ নাটক, ডাকের গান, কালিয়দমন গান, দানখণ্ড নাচ যেসব এক সময়ে প্রচলিত ছিল, সেই সব ক্ষেত্রে একজন প্রধান রূপকার বা অভিনেতা নাচবেন এবং তাঁকে ঘিরে অনুচরেরা গাইবে এই প্রথার উল্লেখ আছে বাংলার সমস্ত প্রাচীন অভিনয় সাহিত্যে।

"এক কথায় প্রাচীন বাংলার সকল সাহিত্যই অভিনেয়। অর্থাৎ আমাদের দেশের প্রাচীন বাংলা মঙ্গলকাব্য বা অনুবাদ-

গ্রন্থ যে শুধু ভক্তি-সুললিত কণ্ঠে সুর-লয়-তানে পড়া হইত তাহা নহে,—চামর মন্দিরাদি সহযোগে বিশেষ সাজে সজ্জিত হইয়া গায়ক উহা গান করিতেন। পয়ার-অংশ সুরে আবৃত্তি করার ভার ছিল মূল গায়ক বা অধিকারীর। লাচারী-অংশ গান করিত অনেকে মিলিয়া। এখনও রামায়ণ গান, মনসার ভাসান গান প্রভৃতিতে ঐ একই রীতির অনুসরণ দেখিতে পাই।"(শীল, পৃ ৪৪)

বৈদ্যনাথ শীলের বিশ্লেষণে, "বুদ্ধনাটক, ডাকের গান প্রভৃতির উল্লেখই পাইতেছি, নিদর্শন কিছু মিলিতেছে না। সুতরাং চৈতন্যদেবের অভিনয়ের উহাই আদর্শ কিনা ইহা জোর করিয়া বলার উপায় নাই। তেমনি একথাও স্বীকার করিতে হয় যে, চৈতন্যদেবের অভিনয়ে যেমন একজন নৃত্য করিতেছে আর অনুচরেরা সময়োচিত গান করিতেছে, ঠিক তেমন তেমন নৃত্য-গীতের বর্ণনা রহিয়াছে ঐ ডাকের গান প্রভৃতিতে। অতএব চৈতন্যদেবের অভিনয়ে উহাদের প্রভাব পড়িয়াছে ইহা মনিতেই হয়। বিশেষ করিয়া কালীদহের কৃষ্ণলীলাকে নাচিয়া গাহিয়া পালার আকারে রূপ দেওয়ার উল্লেখ ডাকের গানে পাইতেছি।" (শীল, পৃ ৪৪)

আমাদের বিচারে চৈতন্যদেব যে সংস্কৃত বাদ দিয়ে লোক-প্রচলিত আঙ্গিকই গ্রহণ করবেন এতে কোনও দ্বিমত থাকবার কথা নয়। আধুনিক বঙ্গ সংস্কৃতির প্রায় সমস্ত আঙ্গিকই নদীয়া ভূখণ্ড প্রসূত, আর সেখানে উচ্চনীচ, শিষ্ট-অশিষ্ট, সংস্কৃত বা 'লোক' বিষয়ের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন কবি ভারতচন্দ্র থেকে শুরু করে আখড়াই গান, তৎকালীন কৃষ্ণযাত্রা, ঢপ-কীর্তন, খেঁড়ু বা খেঁউড়, বোলান প্রভৃতির লিখিত ইতিহাস বিশ্লেষণে অনায়াসে

বোঝা যায়। যে পরম্পরা আজও সমানভাবে বহমান। মনে রাখতে হবে ভারতচন্দ্রের সে নগরে আজও শিক্ষিত অশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বা পাগলা প্রায় সকলের কাছেই তার নিজ-বান্ধব ঠেকে "যে কথায় নেইকো **, সে কথা ন্যাড়া ন্যাড়া"—লিখিত রূপে ছাপার অক্ষরে একথা দেখে জনবিযুক্ত কিছুজন তাঁদেরকে সমষ্টিভুক্ত করায় আপত্তি তুলতে পারেন, তাঁরা নেহাৎই নির্বোধ ন্যাকা-চণ্ডী, যাদের প্রসঙ্গেই একথা বলতে হলো। আমরা লোক বা ফোক বিষয়ে কথা বলছি মাথায় রাখতে হবে। নদীয়ার সুপ্রাচীন শহরগুলির আপামর মানুষের কথ্য খিস্তি যে কি সুনিপুণ উচ্চ মার্গের ভাষাশিল্পের পর্যায়ে অবস্থান করে সে রস অনুধাবনের মত সুর-স্বর ও শব্দ জ্ঞান তাঁদের অনর্জিত রয়ে গেছে। রসিকেরা এ সাধু বচনেও স্মিত হাস্যমুখ হয়ে উঠছেন সন্দেহ নেই।

[** "বাঁশবেড়িয়ার আদ্যাক্ষর গুপ্তিপাড়ার শেষ"]

চৈতন্যপূর্ব অভিনয় সাহিত্যের কথা বলতে গেলে বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর প্রসঙ্গ এসে পড়ে; কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য কি একটি পালার রূপ?

যাত্রা শিল্পের ইতিহাস-এ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* প্রসঙ্গে আলোচনায় দেখা যায়, কয়েকটি পালার সমষ্টিগত মিলনে গঠিত এটি একটি অখণ্ড পালা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাম্বুলখণ্ড থেকে বংশীখণ্ড একটি করে অংক হিসেবে বিবৃত হয়েছে। এখানে বড়ু চণ্ডীদাস (১৩৭০-১৪৩০) 'জন্মখণ্ড'-কে প্রস্তাবনা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অনেক পরে গোবিন্দ অধিকারী (১৮০০-১৮৭২), কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮) এঁরা বড়ু চণ্ডীদাসের 'জন্মখণ্ড'কে তাদের পালায় মুন্সিয়ানার সঙ্গে

আরোপ করেছেন। তাঁরা আরও বিস্তৃত করেছেন গান। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পালার সঙ্গে 'কৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাবের মিল আছে। কৃষ্ণকমলের পালা মূলতঃ সঙ্গীত প্রধান, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও গানে গানে ভরা। কৃষ্ণকমলের পালার প্রস্তাবনার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রস্তাবনার অনেক ক্ষেত্রে মিল। কৃষ্ণকমলের পালার যে কাহিনী বা পাত্র-পাত্রীদের যে মনোভাব তা এক একটা সম্পূর্ণ গানের মাধ্যমে উক্তি ও প্রত্যুক্তিতে প্রকাশ পেত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও মূলত তাই। কৃষ্ণকমলের সংলাপ পয়ার ও ত্রিপদী শ্লোকের ভিতর দিয়ে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একই গানের পদগুলি দু'জনের উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে। কৃষ্ণকমল তাঁর গীতাভিনয়ে রাধাকে যেমন করে এঁকেছেন, রাধার উক্তি এবং কাজ যা দেখিয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাও সেই ভাবে চিত্রিত। কৃষ্ণকমলের রাধা যেমন করে কৃষ্ণ বিরহে যোগীনি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাও তাই। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের সময়ের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আঙ্গিক সম্পর্কে অনুমান ভিন্ন কোনো পন্থা নেই।

"পালাকার রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ বল্লভ' পালা থেকে বাঙ্গালা যাত্রার উৎপত্তি যে ব্যাখ্যা অনেকেই দিয়েছেন। রামানন্দের পালায় 'গীতগোবিন্দ'-এর প্রভাব ছিল। 'গীতগোবিন্দ'র প্রধান ঐশ্বর্য হলো গান, যে গান অনুপ্রাসে সমৃদ্ধ করে কবি জয়দেব বৈষ্ণব সাহিত্যে নতুন চেতনার জোগান দিয়েছিলেন। রামানন্দের পালায় শ্রীকৃষ্ণের জয়গানই প্রধান। এই জন্যই তাঁর পালায় গীতগোবিন্দর প্রভাব বেশি। রামানন্দের 'জগন্নাথ বল্লভ' পালায় দীর্ঘ প্রস্তাবনা এসেছে নান্দীর পর। প্রস্তাবনার সমাপ্তিতে নেপথ্যে সংস্কৃত শ্লোক। এরপরই কৃষ্ণরূপ বর্ণনাত্মক গান।

রায় রামানন্দ তাঁর পালায় অঙ্কভাগ করেছেন। প্রথম অঙ্কের নাম—পূর্বরাগ; দ্বিতীয় অঙ্ক—ভাব পরীক্ষা; তৃতীয় অঙ্ক—ভাব প্রকাশ। রামানন্দের পালায় গল্প ছিল খুবই কম। গদ্য সংলাপ সংগীত ও শ্লোক অবতারণার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।" (ঘোষ, পৃ ২৩)

বাংলার কীর্তন গান প্রসঙ্গে আলোচনায় লেখক মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী বলেন, "চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক প্রধানত দু'রকম গান বিশেষ প্রচলিত ছিল : ১। নাটগান, ২। ধামাইল গান। বীরভূম অঞ্চলের সাধারণ লোকেরা করতেন নাটগান। এ গানের মূল স্রষ্টা যেই হউন, এর মূল প্রচারক ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ স্বয়ং। বৈষ্ণব-বন্দনায় পাওয়া যায় :

"দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ প্রভু নিত্যানন্দ।
যাহা হৈতে নাটগীত সভার আনন্দ।।"

'নাটগীত' বলতে নাটকগীত, যার সংস্কৃত প্রকরণ হ'ল 'রায়ের নাটকগীতি'। গান যাই থাক, বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ অভিনয়। তারই অপভ্রংশ পরবর্তীকালে পশ্চিম দিনাজপুরের রাজবংশীদের 'নটুয়া'। এই নটুয়াতে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ছোটখাটো কিছু উপাখ্যান বা চরিত্র এখনও পাওয়া যায়। কীর্তনের সঙ্গে অনেক ধামালী গান সংযুক্ত হয়েছে। তা ছাড়া কীর্তনের পালা সংকলনের রীতির মধ্যেও ধামাইল-এর প্রভাব পড়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় কীর্তনের পদকর্তাগণ 'পালা' রচনা করতেন না, তাঁরা নায়ক বা নায়িকার বিভিন্ন অবস্থার শাস্ত্রীয় রূপকে নানা ভাবাশ্রিত এবং ভাষাশ্রিত পদ দ্বারা বিন্যাস করতেন। পালাকীর্তনের প্রাথমিক উপভোগ্য যে ঘটনার নাটকীয়তা, তা সৃষ্টি করেন গায়কগণ, এবং এ সৃষ্টির

প্রেরণা যোগায় 'নাটগান' এবং 'ধামাইল', অর্থাৎ 'মঙ্গলগানের রীতি'। 'কড়চা' গানও 'ধামাইল'-এর অন্য প্রকরণ—অবশ্য ধামালীতে বিরহসূচক পদের আতিশয্য বিশেষ নাই—প্রায় সবই মিলনাত্মক। কীর্তনে 'ধামাইল'-এর প্রভাব আছে বলেই 'ধামালী' বলে একটি তালও কীর্তনে প্রচলিত হয়েছে এবং তালটির ব্যবহারও খুব বেশী।" (*বাংলার কীর্তন গান*, মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী পৃ ৮৭)

'রায়ের নাটকগীতি' বলতে যাঁর কথা বলা হয়েছে তিনি চৈতন্যের পরিকরদের মধ্যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, রামানন্দ রায়। ইনি উড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং ইহার উপাধি ছিল 'রাজা'। ইহার পিতার নাম ভবানন্দ রায় এবং চারি ভ্রাতার নাম গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি এবং বাণীনাথ। ইহাদের বাড়ী ছিল মধ্যভারতে বিদ্যানগরে। ইনি 'জগন্নাথ বল্লভ' নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের লেখক। যে কয়েকখানি পুস্তকের শ্লোক চৈতন্যদেব দিনরাত গান করিতেন—তন্মধ্যে 'রায়ের নাটকগীতি' একখানি। (দ্র. *বৃহৎ বঙ্গ*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৭)

এখানেও আমরা পাচ্ছি—"পালাকীর্তনের প্রাথমিক উপভোগ্য যে ঘটনার নাটকীয়তা, তা সৃষ্টি করেন গায়কগণ, এবং এ সৃষ্টির প্রেরণা যোগায় 'নাটগান' এবং 'ধামাইল', অর্থাৎ 'মঙ্গলগানের রীতি'।" অর্থাৎ প্রাচীন বাংলার লোকপ্রচলিত আঙ্গিকগুলিই আধুনিক যাত্রাপালার জনক, 'সংস্কৃত নাটক' নয়।

বাংলায় যাত্রা ও ব্রজেন্দ্রকুমার দে গ্রন্থে গবেষক রতনকুমার মণ্ডল লিখেছেন, "চৈতন্যদেবের আর্বিভাবকালে কৃষ্ণযাত্রা

প্রচলিত থাকলেও মহাপ্রভুর হাতে কৃষ্ণযাত্রা একটি অন্য মাত্রা পায়। মহাপ্রভুর পূর্বে বাংলাদেশে যাত্রার প্রচলন ছিল ঠিকই কিন্তু চরিত্রানুযায়ী সাজসজ্জা সহকারে আসরে অভিনয়ের প্রবর্তন চৈতন্যদেবের হাতেই হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে (আনুঃ ১৫০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীচৈতন্যদেব সপারিষদ সারারাত্রি ধরে কৃষ্ণলীলাভিনয় করেছিলেন। সে বর্ণনা আমরা পাই কবি কর্ণপুরের "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" নাটকে। বৃন্দাবনদাসও 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত'এ (মধ্য খন্ড ১৮শ অধ্যায়) সে বর্ণনা দিয়েছেন।"(পৃ. ৫)

নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করার সময়কে অনেকে আবার ১৫০৯ অথবা ১৫৩৯ অব্দ হিসেবে অনুমান করেন। কালক্রমে এ দেশে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রভাব যখন ছড়িয়ে পড়ল তখনই কৃষ্ণ বিষয়ক নানা উৎসবের প্রসার। আর সেই প্রসারের পরই নবরূপে কৃষ্ণযাত্রার জন্ম। এরই অঙ্গ হল 'ঝুলন যাত্রা', 'হিন্দোল যাত্রা', 'রাসযাত্রা' ইত্যাদি।

ষোড়শ শতাব্দীতেই প্রথম অভিনয় অর্থে 'যাত্রা' শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বাংলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চল আসামের শঙ্করদেবে 'অঙ্কীয়া নাটে'। নাট্যগবেষক মণীন্দ্রলাল কুণ্ডু, *বাঙালীর নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ* গ্রন্থে বলেছেন, "১৪৮১ খ্রিস্টাব্দের পর চিত্রপট অঙ্কন করে শঙ্করদেব নাচগান সহযোগে যে 'ভাওনা' করেছিলেন তার নাম ছিল 'চিহ্নযাত্রা'। এ থেকে মনে হয়, 'যাত্রা' শব্দটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই পূর্বাঞ্চলে নাটকের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। শঙ্করদেব অবশ্য নাট, নাটক ও যাত্রার মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন নি। তবু যাত্রার বৈশিষ্ট্য থেকে তাঁর পালাগুলি বঞ্চিত ছিল না।" (পৃ. ১৬১)

বাঙলা লোকনাট্য সমীক্ষা-য় গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কবি জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-এর বিস্তৃত সমালোচনা করে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— "গীতগোবিন্দ রচিত হইবার পূর্বে রাধা কৃষ্ণের প্রেম-কথা লইয়া যে সকল ছোট ছোট পদ লোকসমাজে প্রচলিত ছিল লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় তাহার পূর্ণতা সাধন করেন। ওই সময় রাজসভা এবং পণ্ডিত সমাজ লোকায়ত ভাষার তেমন সমাদর করিতেন না [...] তাই কাব্য রচনায় জয়দেবকে সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। লোকায়ত বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত গীতগোবিন্দ তৎকালীন গীতিনাট্যের পরিচয় বহন করিতেছে। [...] পরবর্তীকালে ষোড়শ শতকে লোকায়ত বিষয়বস্তু লইয়া সংস্কৃত-পণ্ডিত লোকভাষাকে বাদ দিয়া সংস্কৃত প্রীতির জন্য সংস্কৃতেই নাট্য রচনা করিযাছেন। রূপ গোস্বামীকৃত 'দান কেলি কৌমুদী' নাটকে ইহার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। [...] গীতগোবিন্দ কাব্য ও নাটকের গঙ্গাযমুনা-সংগম। এই কারণেই জনগণের রসতৃষ্ণা নিবারণে ইহা অস্বাভাবিক সফলতা লাভ করিয়াছিল। এই নাট্য কাব্যে যে রচনা রীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহা ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রশাসিত নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে; বস্তুত গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও ইহাতে রাধাকৃষ্ণ-কথা অবলম্বনে রচিত এবং নাট্যনির্দেশ, মন্তব্য, আবৃত্তি, গীতি ও নৃত্য সহযোগে পরিবেশিত তৎকালীন লোকনাট্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এমনও হইতে পারে যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ লইয়া জনগণের মধ্যে যে যাত্রা বা লোকনাট্য পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল দরবারী কবি জয়দেব

তাহাই রাজরুচি অনুযায়ী মার্জিত করিয়া সংস্কৃতে পরিবেশন করিয়াছেন।" (পৃ ১২৯-৩০)

চতুর্দশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে চোখ রাখলে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে দেখা যায়, তদানীন্তন অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ, উৎসব ইত্যাদি জনজীবনের শরিক ছিল, তেমনি বিদ্যাভ্যাস ও শাস্ত্র অধ্যয়নেরও চর্চাও ছিল পাশাপাশি।

সাংসারিক বিপদমুক্তির জন্য 'মঙ্গলচণ্ডী', সাপের ভয় থেকে মুক্ত থাকার জন্য 'মনসা', 'পদ্মা', 'বিষহরি'-র গান, বসন্ত বা ওলাওঠা রোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য 'শীতলার গান', তা ছাড়া সন্তান লাভের বাসনা ও সন্তানের মঙ্গল কামনার জন্য ছিল যথাক্রমে 'কার্তিক' ও 'ষষ্ঠীর গান'। তা ছাড়া 'বাসলী' ও 'গজলক্ষ্মী'র গানও বহুল প্রচলিত ছিল। এই সব আনন্দ বা প্রমোদ অনুষ্ঠানে 'গান'-এর সঙ্গে করতাল, মৃদঙ্গ ব্যবহার করা হত। অবস্থা বিশেষে ঢাক, ঢোল, ডঙ্কা, বীণা, সানাই, বাঁশি, কাসি ইত্যাদি প্রায় বিয়াল্লিশ রকমের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হত। আজও এইসব উৎসব গান বাদ্যযন্ত্র বহাল তবিয়তে রয়েছে। স্বাভাবিক বদলটুকু বাদ দিলে দেখা যাবে 'লোক' থেকে তা 'জন'-এ ছড়িয়ে পড়েছে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে। ইউ-টিউবে অজস্র যাত্রা, লোকউৎসব, লোকগান, লোকনৃত্যের ভিডিয়ো ছড়িয়ে আছে যা আদৌ লোক-সংস্কৃতি চর্চার ফসল হিসাবে নয়, আছে জীবন্ত লোক-মনোরঞ্জনের উপাদান হিসাবে। আমাদের সমাজকে বুঝতে গেলে একথা শিক্ষিত শিষ্ট সমাজের গবেষকদের নতুনভাবে ভাবতে হবে।

উনিশ শতকে বঙ্গদেশে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। বিনোদন শুধুমাত্র দেশীয়দের মনোরঞ্জনে কেন্দ্রীভূত রইল না, তার একটি লক্ষ্য হল বিদেশি শাসককেও তুষ্ট করা। সে সন্তুষ্টির উপায় হিসেবে বাছা হয়েছিল আকছার মদ-মজলিশসহ বাইজিনাচের বন্দোবস্ত করা। নব্য ধনীদের পেশি-ফোলানোর জায়গা ছিল নিজ গৃহে দোল-দুর্গোৎসবের সমারোহে সায়েব-বাবুদের এনে সমৃদ্ধির স্বরূপ দেখানো। পাশাপাশি কবিগান, পাঁচালি, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, যাত্রাগানের ব্যবস্থাও থাকত। সায়েবি থিয়েটারের অনুকরণে দেশি নাটক কোথাও-কোথাও শুরু হলেও এবং যাত্রাকে অশ্লীলতার দায়ে দেগে দিলেও দেশি যাত্রাগানের জনপ্রিয়তা খুব বেশি ক্ষুণ্ণ হয়নি। কারণ যাত্রার কাহিনি, সাজপোশাক, গান ও অভিনয়রীতি দূর-দূরান্ত থেকে মানুষকে টেনে আনত এক অমোঘ আকর্ষণে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ছেলেবেলা*-য় (১৩৫৫, পৃ.২৩) সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন সে-আবেগ: "সেকালে যাত্রাগান ছিল যেন শুকনো গাঙে কোশ-দুকোশ অন্তর বালি খুঁড়ে জল তোলা। ঘণ্টা কয়েক তার মেয়াদ, পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আঁজলা ভরে তেষ্টা নেয় মিটিয়ে।" তাঁদের বাড়িতে থিয়েটার ও যাত্রা উভয়ই অভিনীত হত বলেই দু-টি ধরনের পার্থক্য শিশু রবির মনে যেভাবে ধরা পড়েছিল তা এক ঝলক দেখে নেওয়া যেতেই পারে: "থিয়েটরে এসেছিলেন পেটে-সোনার-চেন-ঝোলানো নামজাদার দল, আর এই যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটোয় ঘেঁষাঘেঁষি। তাদের বেশির ভাগ মানুষই, ভদ্দরলোকেরা যাদের বলে বাজে লোক। তেমনি আবার পালাগানটা লেখানো হয়েছে এমন-সব লিখিয়ে দিয়ে

যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া কলমে, যারা ইংরেজি কপিবুকের মক্‌শো করে নি। এর সুর, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পয়দা-করা; এর ভাষা পণ্ডিতমশায় দেন নি পালিশ করে।"

উনিশ শতকী যাত্রাপালার বিবরণ আমরা পাই রূপকের আড়ালে গুপ্ত-কবির 'মায়া' কাব্যমধ্যেও:

বিশ্বরূপের নাট্যশালা, দৃশ্য মনোহর।
শোভিত সুচারু আলো, সূর্য্য শশধর।।
স্বভাব স্বভাবে লয়ে, সম্পাদনভার।
করিছে সকল সূত্র, হয়ে সূত্রধার।।
শুধু সূত্রধরের কথাই নয়, ছিল বাজনা-বাদ্যির কথা:
জলধর বাদ্যকর, বাদ্য করে কত।
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত।।

তিনি তুলে ধরেছেন অধিকারীর কথাও:

ছয় কালে ছয় কাল হয় ছয় রূপ।
রঙ্গভূমে রঙ্গ করে, ভাঁড়ের স্বরূপ।।
অধিকারী এক মাত্র, অখিলপালক।
আমরা সকলে তাঁর, যাত্রার বালক।।

যাত্রার সাজসজ্জার উল্লেখ করতেও তিনি ভোলেননি:

প্রকৃতি-প্রদত্ত সার, শরীরেতে লয়ে।
বহু সঙ সাজি, বহুরূপী হোয়ে।।

তবে যাত্রার জনপ্রিয়তা এবং প্রভাব-প্রসার থাকা সত্ত্বেও সমালোচনা পিছু ছাড়েনি। 'সমাচার দর্পণ'-এ ১৩ এপ্রিল ১৮২২-এ লেখা হয়: "[...] স্ত্রীলোকের অকর্ত্তব্য এই২ দুষ্ট বুদ্ধিতে অন্য

পুরুষাবলোকন ও সহবাস ও যাত্রোৎসবে গমন ও ব্যভিচারিণীর সংসর্গ। এই সকল কর্ম্ম স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নাশের কারণ হয়।”

সমালোচনা ছিল অভিনয়রীতিরও (*রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, শিবনাথ শাস্ত্রী): “অধিকাংশ স্থলে এই যাত্রা, কবি ও হাফ-আকড়াই অভদ্র বিষয়ে পূর্ণ থাকিত। ইংরাজী শিক্ষা দেশমধ্যে যখন ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তখন হইতে এই সকলের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। অনেকে যাত্রা, কবি প্রভৃতিতে উপস্থিত থাকিতে লজ্জা বোধ করিতেন।”

এই ঘৃণা ফুটে ওঠে ঈশ্বর গুপ্তের কলমে ‘সংবাদ প্রভাকর’-এর পাতায় (২৮ জুন, ১৮৪৮): “কালিয়দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রায় আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাতে প্রমোদমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না।”

যাত্রাকারদের নীচতা উল্লেখিত হয়েছে ‘বাঙ্গলার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন’ প্রবন্ধে বঙ্কিম-উপমায়: “যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।”

মানুষের রুচিসংস্কারে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বিদ্যোসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, ছাতুবাবুর থিয়েটার, রামজয় বসাকের নাট্যশালা, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, পাথুরিয়া ঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়, প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি, বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়, বাগবাজার

এমেচার থিয়েটার, ন্যাশনাল থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, স্টার থিয়েটার প্রভৃতি তৈরি হলেও বৃহত্তর জনমানসে যাত্রার স্থানচ্যুতি ঘটেনি। যে 'বিদ্যাসুন্দর' পালা নিয়ে সর্বাধিক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল সে-পালাটিকে ঘিরেই ছিল দারুণ জনপ্রিয়তা, যার হদিশ পাওয়া যায় বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, 'বিদ্যাসুন্দর' পালার আলোচনায় ('যাত্রা', 'বঙ্গদর্শন', পৌষ১২৭৯, পৃ.৪৫৯): "[..] বিদ্যা তখন উঠিয়া কঙ্কাল দোলাইয়া, নয়ন ঠারিয়া নাচিতে নাচিতে আড়খেমটায় শোক করিতে থাকে। নৃত্য দেখিয়া দর্শক মণ্ডলীতে রসের স্রোতঃ বহিতে থাকে, অমনি বাহবার ঘটা পড়িয়া যায়। বিদ্যা আরো ঘুরিয়া২ নাচিতে থাকে। রসিক শ্রোতাদিগের আহ্লাদের আর সীমা থাকে না, বিদ্যার কঙ্কাল কেমন দুলিতেছে!"

উনিশ শতকের পূর্বের যাত্রা, এমনকি কৃষ্ণযাত্রা সম্পর্কে আলোচনায় অশ্লীলতা শব্দটা বারবার উঠে আসে এ যুগের গ্রন্থ গুলিতেও, কেন? কারণ লেখকেরা যেসব পূর্বরচিত গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন, সেগুলিতে সেই সময়ের ওই বিশেষ শিষ্ট গোষ্ঠীর অভিমতটিকেই এক এবং একমাত্র ধরে নিয়ে শিক্ষিত হয়েছেন, তাই তাঁদের লিখিত আলোচনাতেও সেটি অশ্লীল অভিধা পেয়েছে। কিন্তু তার পরবর্তী কালের সমাজে সেই ধরনের অশ্লীলতা কি লোপ পেয়েছে? নাকি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে? যদি তাই না-হবে তাহলে প্রত্যেক যুগে— "আজকালকার ছোঁড়ারা অসভ্য" হয়ে ওঠে কী প্রকারে! আজ একবিংশ শতাব্দীতে 'শ্লীলতা'-কে ন্যাকাপনা বা গ্রাম্যতা ভিন্ন অন্যকিছু ভাবা সম্ভব? এই যে কথা আমরা বলছি, সেটা সেই

সময়ের যাত্রা পালাকাররা ভাবেননি এটা তো হতে পারে না, যাত্রাগানে তার নমুনা হস্তগত না হলেও উনিশ শতকের শেষার্ধে কলকাতার রাস্তায় কাঁসারীপাড়ার সঙের গানে তার নমুনা প্রায় সর্বজনবিদিত।

সঙ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "গৌড়-বঙ্গের প্রাচীন সংস্কৃতির এক অভিনব বিকাশ হইতেছে গত কয়েক শত বৎসর ধরিয়া প্রচলিত চিত্তবিনোদনের ধারা সঙ্। ... আমাদের দেশে 'জাত' বা 'যাত্রা' অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানমূলক শোভাযাত্রায় এইভাবে 'সঙ' সাজিয়া যাওয়ার রীতি বিশেষভাবে পালিত হইত।"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁর *বাঙ্গালা নাটক* গ্রন্থে বলেছিলেন "বাঙ্গালা নাটক রচিত হইবার পূর্বে যে যাত্রা প্রচলিত ছিল, তাহাতে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন হইত না—ভূমিতেই 'আসর' রচনা করা হইত এবং দৃশ্যপটের ব্যবহার ছিল না। সাধারণতঃ পৌরাণিক ঘটনাবলম্বনেই অভিনয়ের 'পালা' রচিত হইত কিন্তু সকল শ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জনের জন্য যাত্রা গাহনা হইত বলিয়া সময় সময় অকারণ হাস্যোদ্দীপন জন্য সং আনিতে হইত। সংআসরে আসিয়া যে অভিনয় করিত তাহা সকল সময় সুরুচি-সঙ্গত হইত না এবং সে সময় সময় অবান্তর উক্তি করিত।" (পৃ ৮)

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, "সেকালের যাত্রাওয়ালারা যখন দেখতেন ভালো অভিনয় করেও যাত্রা বেশ ভালো ভাবে জমে উঠছে না, তখন সাধারণ দর্শকের কাছে আসর জমাবার জন্য সঙ দিতেন। অনেক সময় কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি, অশ্লীল রঙ্গ-

রস, সঙের নাচ প্রভৃতি যাত্রার মধ্যে অনেকটা স্থান অধিকার করে থাকত এবং তা শালীনতাবিহীন হলেও তেমন নিন্দনীয় ছিল না।"

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে* গ্রন্থের তথ্য সহায়তায় শম্পা ভট্টাচার্য 'নয়কো শুধু হালকা হাসি, নয়কো শুধু মজা, প্রসঙ্গ : সঙ' নামক একটি ওয়েব নিবন্ধে বিষয়টি খুব সুন্দর ভাবে লিখেছেন।

"অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে— দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কৃষক বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ —কোলাহল মুখর নানা বিতর্কে সে সময়ে মুখর ছিল বাঙালি সমাজ। ভদ্রসমাজের নব অর্জিত গোঁড়া রুচিবোধ সঙের গানে অমার্জিত টীকা টিপ্পনী মেনে নিতে পারেনি বলে শিক্ষিত শ্রেণীর সম্পাদিত কাগজপত্রে তা বন্ধ করে দেবার দাবি উঠেছিল। এই সোচ্চার সংস্কৃতির জঙ্গী অভিব্যক্তি ছিল সঙ। অসহিষ্ণু অভিজাতবর্গ ইংরেজ শাসকদের ছত্রছায়ায় আইনের আশ্রয় নিয়ে সাধারণের বিনোদনের রাস্তাগুলি বন্ধ করে কৃত্রিমভাবে মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করলেন। কলকাতার রাস্তাঘাট থেকে ইতর শ্রেণীর এই সব উৎপাত তুলে দেবার সংকল্পে ১৮৭৩ খ্রীঃ ২০শে সেপ্টেম্বর টাউন হলে ভদ্রজন সমবেত হয়ে Society for the suppression of Public obscenity প্রতিষ্ঠা করে। এদের উদ্দেশ্য জনমানসের শুদ্ধতা রক্ষা করে পিনাল কোড এবং প্রিন্টিং অ্যাক্ট এর প্রয়োগে সরকারকে সাহায্য এবং দেশের নবসৃষ্ট সাহিত্যকে দূষিত করা যাবে না এই সংকল্প ঘোষণা করা। এর অন্তরালে লুকিয়ে আছে য়ুরোপীয় যুগের ভিক্টোরীয় রুচির প্রভাব। 'নব্যভারত পত্রিকা' লিখেছে যে— "কাঁসারীপাড়ার বাবু

তারকনাথ প্রামাণিকের উৎসাহে কাঁসারীরা মহা উৎসাহে সঙের মিছিল বার করত। সেই সময় মহাত্মা বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে কলিকাতার অনেকগুলি কৃতবিদ্য লোক ও খ্রীষ্টান পাদরী একটি অশ্লীলতা নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার অনুরোধে গভর্ণমেন্ট প্রকাশ্যপথে অশ্লীল সঙ্গীতাদি নিবারণোদ্দেশে দণ্ডবিধির প্রচার করায় ঐ মিছিল বন্ধ হইয়া যায়।" 'নব্য ভারত পত্রিকা' আরও জানিয়েছে যে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মতো সংবাদপত্র ওই মিছিলকে বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি। কাঁসারীপাড়ার সঙের মিছিল বন্ধ করার চেষ্টা করেন হগ্ সাহেব। সেদিন সঙের দল গান বেঁধেছিল—

শহরে এক নূতন হুজুগ
উঠেছে রে ভাই
অশ্লীলতা শব্দ মোরা আগে শুনি নাই।
বৎসরান্তে একটি দিন
কাঁসারীরা যত
নেচেকুঁদে বেড়ায় সুখে
দেখে লোকে কত।
যদি ইহা এত মন্দ
মনে ভেবে থাকো,
নিজের মাগ্‌কে চাবি দিয়ে
বন্ধ করে রাখ।

আবার ১৮৭৪ সালে কাঁসারী পাড়ার সঙদের বিরুদ্ধে যে অভিযান তাকে বলা যেতে পারে উনিশ শতকের বাংলা সংস্কৃতি জগতে দুই ভিন্নধর্মী ধারার সংঘাতের এক চরম অভিব্যক্তি। একদিকে অভিজাতদের শিল্পসাহিত্য অন্যদিকে নিম্নবর্গের

গান বাজনা এই দুটি ধারা গত শতকে বিচিত্র গতিতে চলেছে। এক ধরনের অস্বস্তিকর সহাবস্থানে দুইপক্ষ নিজের পথ খুঁজে ফিরেছে বারবার। বিলীয়মান মোগল সাম্রাজ্যের দরবারী নাচগান, ধ্রুপদী সংগীত, লোকসংস্কৃতি আর নবাগত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে একটানা অসম টানাপোড়েন চলেছিল। নতুন শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় পাশ্চাত্যের প্রভাবজনিত নিজস্ব সাংস্কৃতিক রুচিতে টইটুম্বুর হয়ে রইলেন। অসহিষ্ণু অভিজাতবর্গ ইংরেজ শাসকদের ছত্রছায়ায় আইনের অস্ত্রে তথাকথিত ইতর শ্রেণীর বিনোদনের পথ রোধ করেছিলেন। সেকালে 'বসন্তক' পত্রিকা প্রশ্ন করেছিল— 'এখানে সামান্য লোকের আমোদ আহ্লাদ ও উৎসব তো সকলি একে একে শেষ হইতেছে। এখানে যাত্রা নাই, পাঁচালী নাই, কবির তো কথাই নাই। সামান্য লোকেরা কি লইয়া থাকিবেক?' 'সামান্য লোকেরা' বুঝেছিলেন যে সমাজের সমস্যাটা কোথায়—তাই তারা গান গেয়েছেন ভদ্রলোকের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে—

সস্তা দরে মস্ত নাম
কিনতে যত লোক
এই সুযোগে তাদের
সবার ফুটে গেল চোখ
গরিবের মাথায় কাঁঠাল
ভেঙে এরা ভাই
ইংরেজদের কাছে কেমন
দেখাচ্ছে বড়াই। —বসন্তক, ২য় পর্ব, ১০ সংখ্যা, ১৮৭৪"

https://www.parabaas.com/PB59/LEKHA/pShampa59.shtml

আশ্লীলতা বিষয়ে সঙের গানটির কিছুটা অন্যরূপেও পাওয়া যায়—"শহরে এক নূতন হুজুগ উঠেছে রে ভাই

অশ্লীলতা শব্দ মোরা আগে শুনি নাই
এর বিদ্যাসাগর জন্মদাতা
বঙ্গদর্শন এর নেতা
এদের কথার মাত্রা অশ্লীলতা
সদা দেখতে পাই।"

সেসময় 'সংবাদ প্রভাকর'-এর মত অনুসারে "প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ তৎপ্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা প্রদেশের পক্ষে শ্লাঘনীয় অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই।"

"যে সব সখের দল গীতাভিনয়ে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভবানীপুরের উমেশচন্দ্র মিত্রের দল, কলিকাতায় আরপুলি গলির দল ও সিমুলিয়ার "সখের যাত্রা কোম্পানি"। সখের দলগুলি সুপরিচিত নাটকগুলিই অতিরিক্ত বহু গান সংযোজন করিয়া গীতাভিনয়ের উপযোগী করিয়া লইত।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্রকাশিত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শকুন্তলা" বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম "অপেরা' বা 'গীতাভিনয়।...

গীতাভিনয় যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি রূপ হইলেও সঙ্গীত প্রাধান্যের ফলে ক্রমে গীতাভিনয় ও যাত্রা সমার্থক হইয়া পড়িল।

তবে প্রাচীন যাত্রার সহিত গীতাভিনয়ের পার্থক্য এইখানে যে, গীতাভিনয় যাত্রাতে ঘটনার সংহতি দৃঢ়তর এবং সংঘাত তীব্রতর হইয়া উঠিল।..”

তৈরি হতে থাকল নানা নতুন দল। তবে সবাই যে নেশাদার অভিনেতা ছিলেন তানয়, কেউ-কেউ পেশাদার হওয়ার স্বপ্নও দেখতেন।

যেমন দল গড়েন ভবানীপুরের বেলতলার প্যারীমোহনের, জগমোহন বসু, গোপাল উড়ে, উমেশ মিত্র, বীরসিংহ মল্লিক, রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, দ্বারকা মল্লিক, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল, কালী হালদার, বোকো আর সাধু, ঝড়ু দাস, চয়ে পাগলা, জয়গোপাল/নবগোপাল মিত্র, রাধাবিনোদিনী, স্বরূপ দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, অক্রুর দত্ত, রাধামোহন সরকার, শ্রীনাথ সেন, হরিমোহন রায়, কাশীমালিনী, ঠাকুরদাস মিত্র, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, রাইচরণ অধিকারী, বঙ্কু মিত্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ। এই দলে যেমন শখের যাত্রাদলের বড়োঘরে ছেলেছোকরারা ছিলেন, ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষের মতো সংবাদপত্র-প্রকাশক, তেমনি ছিলেন যাত্রপাগল অভিনয়রসিক অনেকেই। আসলে শখের যাত্রা দলের শুরু অনেক আগে। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে (‘যাত্রার ইতিবৃত্ত’, ‘বঙ্গদর্শন’, ফাল্গুন ১২৮৯, পৃ. ৫১৩): “যিনি এই যাত্রা প্রথম প্রস্তুত করেন, তিনি অর্থ কামনায় করেন নাই, “সখ” করিয়া দল করিয়াছিলেন, এই জন্য লোকে এই দলকে “সখের” দল বলিত। তাহার পর যখন অন্য অনেক লোকে অর্থ লোভে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে লাগিল, তখন সেই নাম

থাকিয়া গেল। লোকে বুঝিল, যাহাতে ঢোলক তবলা আছে, তাহা সখের দল; আর যাহাতে খোল করতাল আছে তাহা কালীয়-দমন।

সখের দল ও কালীয় দমনের মধ্যে আর একটু প্রভেদ আছে। দেবতার প্রসঙ্গ ভিন্ন কালীয় দমন যাত্রা হইতে পারিত না, কিন্তু সখের যাত্রায় তাহা নিষেধ ছিল না, মনুষ্যের ঘটনা লইয়া এ যাত্রা হইত, যথা বিদ্যাসুন্দর, নলদময়ন্তী।"

শখের যাত্রা বা কালীয় দমন—দু-ধরনের পালারই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেকালের বাবুরা। অভিনয়ও হত তাঁদের বাড়িতে। গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় বা উমেশ মিত্র ছিলেন ভবানীপুরের পয়সাওয়ালা মানুষ। জোড়াসাঁকোর বিত্তবান বীরসিংহ মল্লিক গোপাল করণ বা গোপাল উড়েকে ডেকে নিয়েছিলেন শখের যাত্রাদলের প্রয়োজনে। ছাতুবাবু (আশুতোষ দেব) বা তাঁর দেওয়ান রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছিল শখের দল—এঁর দলের যাত্রা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস) "[...] গতানুগতিক যাত্রা থেকে স্বতন্ত্র ছিল। ইহাতে স্ত্রী চরিত্রে মেয়েরা অভিনয় করতেন।" শখের যাত্রার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বারানসী ঘোষ, জোড়াসাঁকোয় তাঁর বাড়িতে রামচাঁদের *নন্দবিদায়* যাত্রায় দশ হাজার লোক হয়েছিল। জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ মল্লিকের বাড়িতে মাইকেলের *শর্মিষ্ঠা* নাটকের যাত্রারূপ অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথের মেজোকাকা গিরীন্দ্রনাথ ও পাথুরেঘাটার হরকুমার ঠাকুরের ছেলে যতীন্দ্রমোহনের শখের দল ছিল। অভিনয় হত শোভাবাজার রাজবাড়িতেও। সিমলেপাড়ার জয়গোপাল ও নবগোপাল মিত্র *শ্রীবৎসচিন্তা* যাত্রার দল করেন।

বাবুদের মতোই যাত্রাদল গড়তে পিছিয়ে ছিল না রক্ষিতা-বারবণিতারাও, যেমন নিমতলার রাধাবিনোদিনী, চিতপুরের কটাগোলাপি, জোড়াবাগানের ভবতারিণী—এঁদের দলে মূলত মেয়েরাই অভিনয় করত। তবে মেয়েদের দলের অভিনয় যাত্রায় এঁরাই প্রথম ছিলেন তা বলা যাবে না, ১৮২৬-এ মণিপুরের মহিলা পরিচালিত যাত্রাদলের কলকাতায় অভিনয়ের কথা 'সমাচার দর্পণ'-এর পাতায় প্রকাশিত হয় (১৯ অগস্ট, ১৮২৬):

> "মণিপুরের এক সম্প্রদায় যাত্রাওয়ালা সংপ্রতি আসিয়াছে ইহারা এই কলকাতার মধ্যে কোন ২ স্থানে যাত্রা করিয়াছে কেহ ২ দেখিয়া থাকবেন সংপ্রতি ২৯শে শ্রাবণ শনিবার রাত্রিতে কলুটোলানিবাসি শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীলের বৈঠকখানায় ঐ যাত্রা হইয়াছিল তাহারদিগের নৃত্যগীতাদি আরম্ভ ও শেষ পর্য্যন্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তদ্বিবরণ স্থূল লিখিতেছি
>
> আশ্চর্য্য সম্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল।
> স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল।।
> ললিতা বিসাখা চিত্রা আর রঙ্গদেবী।
> সুদেবী চম্পকলতা তং বিদ্যাদেবী।।
> ইন্দুরেখা সাজি সবে রাসলীলা করে।
> পুরুষে বাজায় বাদ্য নারী তাল ধরে।।
> কৃষ্ণের সহিত রঙ্গ করয়ে রসিকা।
> রসিকার রূপ শুন নাহিক নাসিকা।।
> গুণবতীদিগের গুণ অতি উচ্চস্বরা।
> শুনিলে সে মিষ্টস্বর না যায় পাসরা।।
> বাদ্যতালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ফঝম্ফ।
> গান করে জয়দেব মুদ্রা তার কম্প।।"

উনিশ শতক জুড়ে সংস্কার চললেও কিন্তু যাত্রাগানের প্রকৃত সংস্কারসাধন ঘটে মূলত মদন মাস্টারের হাতে। হুগলি কলেজের

শিক্ষক ফরাসডাঙার মদন চট্টোপাধ্যায় প্রথমে শখের দল গড়লেও পরে চাকরি ছেড়ে পেশাদার দল গঠন করেন। তিনি যাত্রায় ব্যবহৃত নাচ-গান, সুর-বাজনা, সাজ-পোশাক প্রভৃতির পরিবর্তন করেন। আগে পোশাক-পরিচ্ছদের কোনো নির্দিষ্ট রীতি ছিল না—যে যা খুশি সাজত। গোবিন্দ অধিকারী বৃন্দার ভূমিকায় জরি-দেওয়া সালুর কাপড় ব্যবহার করতেন, লোকাধোপা স্ত্রী-ভূমিকায় ঢাকাই শাড়ি-চেলি-আসল গহনা ব্যবহার করতেন। কোনো যাত্রায় আবার মোগলাই পাগড়ি মাথায় এলবার্ট চেন-শোভিত চশমা-নাকে রাম-লক্ষ্মণকে কথা বলতেও দেখা যেত। সঞ্জীবচন্দ্রের কথায় ('বঙ্গদর্শন', ১৮৭৫) 'রাণী মেতরানীর এক পরিচ্ছদ'। মদন মাস্টার সব চরিত্রের পোশাকের পার্থক্য বজায় রাখার চেষ্টা করতেন—যেমন, তাঁর দলে রাজার পোশাক ছিল ঢিলা পায়জামা, কোমরবন্ধ, চাপকান, কাবা ও সাঁচ্চার টুপি; রানিরা গরদের চেলি অথবা ঢাকাই শাড়ি পরতেন।

তিনি পালায় চটুল গান একেবারে বন্ধ না-করলেও, গানে রাগরাগিনীর প্রয়োগ শুরু করেন, এছাড়া সংলাপের মাত্রা বাড়িয়ে, সংগীতাংশ অনেক কমিয়ে ছিলেন।

মদন মাস্টারের পরে যাত্রায় অবদানের কথা ভাবলে প্রথমে যাঁর নাম মনে আসে তিনি আধুনিক যাত্রার জনক মতিলাল রায়। তিনি কলম ধরার পর যাত্রায় সবরকম বিকৃতি থেকে মুক্তিলাভের একটা চেষ্টা হয়। নবদ্বীপে মিশনারি স্কুলে শিক্ষিত মতিলাল ১২৮০ সালে অগ্রহায়ণ মাসে নবদ্বীপে একটি দল তৈরি করেন। যাত্রাগানে প্রাণ সঞ্চার করতে তিনি নানান অভিনবত্ব এনেছিলেন। তাঁর যাত্রা ছিল অত্যন্ত আড়ম্বর পূর্ণ।

দলে একশো পঁচিশ থেকে দেড়শো জন লোক থাকত। জুড়ি থাকত আট-দশ জন, ছেলে/বালক থাকত পঁচিশ/ত্রিশজন। ছেলের দলের গান যাত্রায় প্রয়োগ করে তিনি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। এছাড়া ছিল চার-পাঁচজন বেহালাবাদকসহ অনেক যন্ত্রী। অভিনেতা ও গায়কদের পোশাকও ছিল খুব দামি ও অলংকৃত—সেকালেই জরি-মখমলের কাজ-করা প্রায় হাজার-দেড় হাজার টাকার পোশাক মতিলাল রায়ের আগে কেউ যাত্রায় ব্যবহার করেছেন কিনা জানা যায় না। ছেলের দলের অভিনেতাদের মাথায় থাকত টুপি, তা-তে লেখা থাকত বড়ো-বড়ো অক্ষরে 'মতিলাল রায়'। প্রশস্ত জায়গায় তাঁর যাত্রাদলের যে আসর বসত, তার প্রথমে সারিতে বসত বাজনাদারের দল, তার সামনে বালকেরা, এবং সবার আগে জুড়ি। জুড়িরা প্রয়োজন মতো দাঁড়িয়ে গান গাইত। বাজনাদাররা শুরুতে ঢোল বাজিয়ে সকলকে প্রস্তুত করত। এরপর নৃত্যকলা ও সুরের ইন্দ্রজালে দর্শকদের মোহাচ্ছন্ন করার পর নারদ বা ঋষির বেশে মতিলাল স্বয়ং প্রবেশ করে পৌরাণিক কাহিনিকে কেন্দ্র করে বক্তৃতার ঢঙে কথকতার মাধ্যমে দর্শকদের টেনে আনতেন পালার মধ্যে। তাঁর পালায় ব্যবহৃত নাচ-গান ও অন্যান্য সব কিছুর মধ্যে এমন বৈচিত্র্য থাকত যে পালা যত বড়োই হোক-না কেন দর্শকেরা পালা ছেড়ে উঠে কোথাও যেত না। বাস্তবকে তিনি এমন মোহময় করে বুনতেন যে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে দেখে কিংবা বেশভূষায় অলংকৃত দেবদেবীরূপী অভিনেতা-অভিনেত্রীকে চাক্ষুষ করে দর্শকদের মনে অতিরঞ্জনের উস্কানি কখনই জাগত না।

মতিলালের পালা পাঁচালির থেকে নানা দিক দিয়ে পৃথক হলেও সেগুলির উপর পাঁচালির প্রভাব অনস্বীকার্য। *ব্রজলীলা, পারিজাতহরণ, কমলে কৃষ্ণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, হরধনু ভঙ্গ বা রাম বিবাহ, রাম বনবাস, সীতাহরণ, তরণীসেন বধ, রাবণ বধ, রামরাজা, উমাসংবাদ* প্রভৃতি গীতাভিনয়গুলিতে এই লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ *সীতাহরণ* পালায় সীতার রাম ও রাবণের পার্থক্য বিষয়ক সংলাপটি দেখা যেতে পারে:

যেমন সাগর আর কূপে সুমেরু আর স্তূপে।
অমৃত আর বিষে সুবর্ণ আর সীসে।
ত্রিশূল আর শরে, দেবতা আর নরে।
হীরক আর কাচে কুম্ভীর আর মাচে।
বজ্র আর কামানে তেমনি রামে আর রাবণে।।

এরকম আলংকারিক প্রয়োগ দাশরথীর পাঁচালিতেও দেখা যায়। যেমন, *দক্ষযজ্ঞ* পালায় শিবের উক্তিতে:

আমাদের ভাব কেমন জামাই আর শ্বশুরে
যেমন দেবতা আর অসুরে।।
যেমন রামে আর রাবণে। যেমন কংস আর শ্যামে।।
যেমন স্রোতে আর বাঁধে। যেমন রাহু আর চাঁদে।।
যেমন যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধনে। যেমন গিরগিটি আর মুসলমান।।
যেমন জল আর আগুন। যেমন তৈল আর বেগুনে।।
যেমন পক্ষী আর সাতনলা। যেমন আদা আর কাঁচকলা।।
যেমন ঋষি আর জপে। যেমন নেউলে আর সাপে।।
যেমন ব্যাঘ্র আর নরে। যেমন গৃহস্থ আর চোরে।।
যেমন কাক আর পেচকে। যেমন ভীম আর কীচকে।।
যেমন শরীরে আর রোগে।
যেমন দিনকতক হয়েছিল ইংরাজ আর মগে।।

গান-নাটক-পাঁচালি-কথকতার মিশ্রণে মতি রায়ের পালাগান হয়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য। ডাকও আসত নানা দিক থেকে। চকদিঘির ললিতমোহন সিংহরায়ের বাড়ির দুর্গোৎসবে, সিয়ারসোলের রাজবাড়িতে সরস্বতী পুজোয়, মালিয়ার রাজবাড়িতে, বড়জোড়ায় শিবের গাজনে, অন্ডালে রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি বাসন্তী পুজোয়, বর্ধমানের নতুনগঞ্জে গন্ধেশ্বরী পুজোয়, দশঘরার জমিদার বিপিনকৃষ্ণ রায়ের বাড়ি, আমলাজোড়ার জমিদার বাড়িতে, কাশিমবাজার-রাজশাহি-পুঁটিয়া-নাটোরের রাজবাড়িতে।

তবে দল চালাতে খরচও ছিল তাঁর ঢের। মতিলালের দলে ছিলেন মূলত কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ। ধান কাটার সময় ছাড়া তাঁরা যাত্রাদলের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। এঁদের মাসমাহিনা একশো টাকা পর্যন্ত ছিল। শুধু অভিনেতারা নন, অনেক সময় গায়ক-বাদকও আশি টাকা পর্যন্ত বেতন পেতেন।

মতিলালের যাত্রাগানে বহুলাংশেই তাঁর পূর্বসূরিদের প্রভাব ছিল। পূর্বে উল্লখিত দাশরথী রায়ের প্রভাব ছাড়াও পালাকার মনমোহন বসুর প্রভাব তাঁর রচনায় পড়েছিল। তিনি নিজ প্রয়োগ আধুনিকতায় সে-প্রভাবকে শুধু অতিক্রমই করেননি, উনিশ শতকে যাত্রাকে দিয়েছিলেন নতুন দিশা।

মতিলালের পূর্বতন পেশাদার যাত্রাদলের কথা বলতে গেলে বীরভূমের কেঁদেলির শিশুরাম অধিকারী, শ্রীদাম দাস ও সুবল অধিকারী, বীরভূমের পরমানন্দ অধিকারী, লোচন অধিকারী, হুগলির জিরাটের বদন অধিকারী, হুগলির জাহাঙ্গির পাড়ার গোবিন্দ অধিকারী, বর্ধমানের কাটোয়ার পিতাম্বর

অধিকারী, ঢাকা-বিক্রমপুরে কালাচাঁদ পাল, নদিয়ার ভাজনঘাটের কৃষ্ণকমল গোস্বামী, রাজা রামমোহন রায়ের প্রপৌত্র হরিমোহন রায়, বর্ধমানের ধরণী গ্রামের নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, যশোরের কালীগঞ্জের রসিকলাল চক্রবর্তী, রামধন মিস্ত্রি, বরানগরের প্যারীমোহন, গোপাল উড়ে, মহেশ চক্রবর্তী, রিষড়ার কৈলাশচন্দ্র বারুই, বাঁকুড়ার রামজীবনপুরের আনন্দ অধিকারী ও জয়চন্দ্র অধিকারী, পাতাইহাটার প্রেমচাঁদ অধিকারী, বর্ধমানের লাউসেন বড়াল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

মতিলালের পরে তাঁর দুই পুত্র ধর্মদাস ও ভূপেন্দ্রনারায়ণ যাত্রার দল চালাতে থাকেন। তাঁর কাকা হরিচরণ রায়ের ছেলে ব্রজলাল মতিলালের দল থেকে লোক ভাঙিয়ে নিমতলায় আলাদা দল খোলেন। মতিলালের দল ভেঙে আগে বউকুণ্ডু একই রকম প্রয়াস করলেও মতিলাল আবার দল গঠন করে স্বমহিমায় ফিরে এসেছিলেন। মতিলালের অনুপ্রেরণায় তাঁর থেকে বয়সে কিঞ্চিৎ বড়ো নবদ্বীপের নীলকণ্ঠ দত্ত পালা লিখতেন। পালা লেখেন মতিলালের স্নেহধন্য পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। মতিলালের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না তাঁর সমসাময়িক বা পরবর্তী কালের পালাকাররা, যেমন রাজকৃষ্ণ রায়, অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল, বন্ধুবর প্রখ্যাত নট গিরিশ ঘোষ, ব্রজমোহন রায়, মহেশচন্দ্র দাস দে, বন্ধুবিহারী সরকার প্রমুখ, অহিভূষণ ভট্টাচার্য, আশুতোষ চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

সর্বোপরি মতিলালের লক্ষ্য ছিল, গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষের ভাষায় (*যাত্রাশিল্পের ইতিহাস*), "যাত্রাদলকে একটি মিশনে পরিণত করা। যে মিশনের কাজ হ'ল, পালাগানের ভিতর দিয়ে

বঙ্গদেশের সামাজিক চেহারাটাকে তুলে ধরা, অজ্ঞতার অন্ধকার ঘোচানো, গণচেতনা ও লোকশিক্ষার প্রসার।”

নাটক-থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে লোকশিক্ষার তত্ত্বে বিশ্বাসী গদাধর চট্টোপাধ্যায় ছেলেবেলায় গ্রামের পাঠশালা-লাগোয়া জমিতে পালাগানের মহড়ার জায়গা তৈরি করতেন। বন্ধুদের প্রস্তাবে তিনি ছিলেন মাস্টার, প্রধান গায়ক—বাকিরা ছিলেন দোহার। বেশ ক-টা পালাগানও সেইমতো লিখে ফেলেছিলেন গদাই—শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক। পালা অভিনীত হয় মানিকরাজার বাগানে, পালা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল দর্শকদের মধ্যে। তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ পালাগানের পর্ব চলেছিল প্রায় বছর তিনেক—এর-ওর বাগানে, মন্দিরের দাওয়ায়, ঠাকুরদালানে, উঠোনে। পরবর্তীকালে অর্থাৎ বালক গদাধরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস হয়ে ওঠার পর নাট্যপ্রীতিতে স্টার থিয়েটারে ছুটে যাওয়া বা হাটখোলায় নীলকণ্ঠের যাত্রা শোনা হয়তো ছিল সেই ছোটোবেলার ভালো-লাগার টানেরই একটা বহিঃপ্রকাশ।

উনিশ শতকের নবজাগরণীয় বোধ ও সংস্কার চিন্তা বিশ শতকে এসে রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাদেশিকতায় মোড় নেয়। একের-পর-এক ঘটে যেতে থাকে মোড়-ঘোরানো ঘটনা, সংঘটিত হয় তীব্র আন্দোলন, কখনো-বা তা রক্তক্ষয়ী রূপ নেয়, বিদেশি শাসক দেশ ভেঙে ভাগ করার চক্রান্ত শুরু করে, শাসনের নামে শোষণ-পীড়ন বাড়তে থাকে দিনে-দিনে, তীব্র থেকে তীব্রতর হয় অসহযোগ, ইংরাজ ভারত ছাড়ো-র দাবি, শুরু হয় ধর্মঘট-কারাবরণ-অনশন এবং সঙ্গে শাসকের নির্মম অত্যাচার, অর্ধশতাব্দীর মধ্যে ঘটে

যায় দু-দু-টি বিশ্বযুদ্ধ—ভারতের স্বাধীনতা আসে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায়। স্বাধীনতার পরও যে জীবনযাত্রার মান একলাফে উন্নততর হয়েছিল সে-কথাও বলা যাবে না। সংঘর্ষ চলতে থাকে দৈনন্দিন, ব্যক্তিজীবনে তো বটেই, সার্বিক ক্ষেত্রও—যার পরিণাম খাদ্য আন্দোলন, ভারত-চীন যুদ্ধ, ভারত-পাক সংঘর্ষ, প্রতিবেশী নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের উদ্ভব।

যাত্রাগানে সে-প্রভাব ধীরে-ধীরে পড়তে থাকে, প্রতিফলিত হয় সমাজ-সংঘর্ষ মঞ্চে অভিনয়ে-সংগীতে-সংলাপে। উনিশ শতকী *বিদ্যাসুন্দর* বা *কৃষ্ণযাত্রার* স্থান বিশ শতকের গোড়ায় দখল করে নিতে থাকে ঐতিহাসিক পালাগুলি— প্রতাপাদিত্য, রানা প্রতাপসিংহ, শিবাজীর মতো বিদ্রোহী জননায়করা। মঞ্চনাটকের মতো পালাগানেও প্রভাব পড়ে এই স্বাদেশিকতার। যাত্রামঞ্চের স্বাদেশিকতার ঢেউ নিয়ে আসেন বিক্রমপুরের বানারি গ্রামের গুরুদয়াল দে-র পুত্র হিরবোলানন্দ-শিষ্য যজ্ঞেশ্বর ওরফে মুকুন্দদাস । ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় তিন 'স্বদেশী যাত্রা পার্টী' তৈরি করে জনজাগরণের লক্ষ্যে শুরু করলেন পালাগান—*মাতৃপূজা*—স্বদেশিচিন্তা আর বিদেশিপণ্য বর্জনের মন্ত্র সুরের স্রোতে তিনি পৌঁছে দিতে চাইলেন পরাধীন জাতির অন্তরে: "ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা"। কেঁপে গেল শাসকের ভিত, ফলস্বরূপ ১৯০৮-এ ১০৮ ধারায় গ্রেপ্তার হলেন তিনি। পরে মুক্তি পেলেও শাসকের অত্যাচার আর ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসের স্বীকার হলেন এই চারণ কবি ও পালাকার মুকুন্দদাস। শত অবিচারেও তাঁকে দমন করা যায়নি কখনো, অসহযোগ হোক আর আইন অমান্য, তিনি

শানিত ভাষায় যাত্রাগানে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুললেন একের-পর-এক *মাতৃপূজা, পথ, পল্লীসেবা, কর্মক্ষেত্র, সমাজ, ব্রহ্মচারিণী* প্রভৃতি যাত্রা রচনার মাধ্যমে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, স্ত্রীশিক্ষা-বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, মদ্যপান-বারবণিতা সংসর্গের কুফল প্রভৃতি সমাজসচেতনতামূলক বিষয় স্থান পেত তাঁর পালায়। *কর্মক্ষেত্র* পালায় যেমন ফুটে উঠেছে আদর্শ শিক্ষয়ত্রী গার্গীর ভিতর দিয়ে নারীজাগরণের স্বরূপ। মুকুন্দদাসের পালায় অন্য গীতিকারদের গানও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেমন *পল্লীসেবা* পালায় কাজি নজরুলের একাধিক গান ব্যবহৃত হয়েছে। লোকশিক্ষা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে তিনি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখতেন, যদিও যে-স্বাধীনতা তাঁর দেখে যাওয়া হয়নি, কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী জাতি তাঁর সুরে বারংবার গেয়ে উঠেছে:

[...]আর কি দেখাও ভয়?
দেহ তোমার অধীন বটে
মনতো অধীন নয়।
হাত বাঁধিবে পা বাঁধিবে,
ধরে না হয় জেলে দিবে—
মনকে কি ফিরাতে পারবে,
সে তো পূর্ণ স্বাধীন রয়।।
বন্দে মাতরম্ মন্ত্র কানে,
বর্ম এঁটে দেহে মনে।
রোধিতে কি পারবে রণে—
তুমি কত শক্তিময়।।

কিংবা সেই অভয়গীত:

ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে।
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রিমী দ্রিমী দং দং,
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে।
দানব দলনী হয়ে উন্মাদিনী,
আর কি দানব থাকিবে বঙ্গে।
সাজ রে সন্তান হিন্দু মুসলমান
থাকে থাকিবে প্রাণ, না হয় যাইবে প্রাণ।
লইয়ে কৃপাণ হও রে আগুয়ান
নিতে হয় মুকুন্দ রে, নিও রে সঙ্গে।

মুকুন্দদাসের সমকালীন অনেক যাত্রাদল তৈরি হয়েছিল। ১৩০৬ সালে ৮২ নং কলেজ স্ট্রিটে দল খোলেন অভয়চরণ দাস। তিনি মারা গেলে সে-দলের মালিক হন তাঁর জামাই অধর দাস। পরে স্বর্ণকার নীলকান্ত দাস মথুর সাহার সঙ্গে যৌথভাবে সে-দল কিনে নেন—তৈরি হয় মথুরনাথ সাহা থিয়েট্রিকাল যাত্রা পার্টি। মথুর সাহার দল এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে লোকমুখে ছড়া ঘুরত:

মথুর সাহার গান শুনবি।
পাঁচসিকে পয়সা দিবি।।

পালা-রচনা, উপস্থাপনা, অভিনয়-ধারা, শিল্পী-সংগ্রহ, ব্যবসায়িক ভাবনার জন্য মথুর সাহা যাত্রাজগতে চিরস্মরণীয়। সেসময়ে শুধু যাত্রাপ্রীতি থেকে দল চালাতে এসে টিকতে পারেননি এমন নমুনাও কিন্তু কম নয়—যেমন মহেশ চক্রবর্তী, হাওড়ার বেণীমাধব পাত্র, নড়াইলের গৌর প্রামাণিক, নারায়ণ দাস প্রমুখ।

মঞ্চসফল যাত্রার পিছনে পালাকারদের ভূমিকাও বিশেষ-ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এযুগের বেশ কিছু পালাকার সেই মুন্সিয়ানার অধিকারী ছিলেন—যেমন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ রায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল শীল, কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস দত্ত, নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজভূষণ কবিরত্ন, ভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ, মন্মথ-নাথ মুখোপাধ্যায়, রাইচরণ সরকার, রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

পাঁচালি থেকে যাত্রার উদ্ভব তত্ত্বটির বিরোধিতা করেছেন অনেকেই, তবে আমাদের পিতা-পিতামহের মুখে শোনা বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মৌখিক ইতিহাস যা পাওয়া যায় তা-তে শুনি, অনেক আগে থেকেই নদিয়ার বর্ধিষ্ণু প্রায় সমস্ত গ্রামে পুজোর সময় শখের যাত্রার চল ছিল। দু-একটি শিক্ষিত পরিবারের উৎসাহের ফলেই মূলত এগুলো ঘটত। অংশগ্রহণ করতো গ্রামের সবাই অভিনেতা আয়োজক বা দর্শক হিসাবে। রথের পরপরই ঠিক হয়ে যেত কোন পালা ধরা হবে। একজন বাইরে থেকে আসতেন যিনি অনেক সময় নিজেই হতেন পালাকার, তাঁকে বলা হত মাস্টার। পুজোর মাস চারেক আগে তিনি গ্রামে চলে আসতেন, সেখনেই বাস করতেন আয়োজকদের অতিথি হিসাবে। প্রথমে তৈরি করতেন সখীর দল—গ্রামের অল্প বয়সি ছেলেদের মধ্যে থেকে গাইতে ও নাচতে পারবে এরকম দশ-বারো জনকে বেছে নেওয়া হত, তারপরে চলত তাদের প্রস্তুতির পালা। যে-কোনো যাত্রার শুরুতে এরা মেয়ে

সেজে সখীর দল হিসাবে নাচ-গান করে যেত। মাঝে আসত কিছু ক্ষেত্রে। এরা ছিল বস্তুত কোরাস। বাকিদের মহড়া শুরু হত কিছুদিন পর। বাইরে শহরে যারা বাস করত চাকরিসূত্রে, তারাও অনেকে দেশের বাড়িতে এই যাত্রার একটি ছোটো চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সপ্তাহান্তে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝেই রিহার্সালের জন্য চলে আসত। পৌরাণিক ও সামাজিক উভয় প্রকার পালাই প্রচলিত ছিল। সরস্বতী পুজোর সময় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সিরা আলাদাভাবে যাত্রা করত। বাবার মুখে শোনা কলেজে পড়ার সময় একবার যখন দেশের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের *বিসর্জন* নাটক করেছিলেন তখনো লোকজন যাত্রা বলেই দেখতে এসেছিল। বিভিন্ন গ্রামের এই সমস্ত যাত্রাদলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত, এখনকার একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার মতো। এছাড়া আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল চৈত্র মাসের বোলান গান। এই বোলান গানের ইতিহাস বহু প্রাচীন, কবে থেকে শুরু হয়েছে এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো তথ্য নেই। তবে সময়ের সঙ্গে যে বদলেছে তা বোঝা যায়। এই গান অনেক সময়ই গ্রামের দল হিসেবে তৈরি করা হত, তবে সাধারণত বোলান গানের দল বাইরে থেকে আসত, যাত্রার সখীর দলের ছেলেরা তা-তে ভিড়ে যেত। বোলান ছিল সবাই মিলে সমবেত সুর আর নাচতে নাচতে গান, তারপরে কিছুটা নাটকের মতো অংশ ছিল যেগুলোও আসলে গান, অনেকটা সুর করে সংলাপ বলার মতো। সেগুলি করত দু-টি বা তিনটি চরিত্র মিলে— এই অংশকে বলা হতো পাঁচালি। তারপরে শুরু হতো রঙ্-পাঁচালি। রঙ্-পাঁচালি হল সামাজিক বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ, ঠাট্টা—যাতে অনেক তথাকথিত অশ্লীল

বিষয় থাকত। আজকালকার সমাজ মাধ্যমের মিম-এর মতো। সেগুলো যেমন সাধারণ বিষয়ে হত তেমন গ্রামের কিছু লোকের হাঁড়ির খবর নিয়ে সাথে সঙ্গে বেঁধে ফেলা কেচ্ছাও হত। সবাই এই রঙ্-পাঁচালি বেশি উপভোগ করত। একটা মোটামুটি ভদ্র গোছের উদাহরণ দেয়া যাক— ছেলে মাকে বলছে, ভাদ্র মাসের গরমেতে/ বউ পারে না ঘরে শুতে/ বুড়ো মাগী বসে থাকো/ বাতাস করতে পার না। —এগুলো অঙ্গভঙ্গি এবং বিশেষ সুর ও বাজনা সহযোগে পরিবেশিত হত। বোলান গানের মধ্যে এই নৃত্য, গীত, কাহিনি, পাঁচালি ও রঙ্-পাঁচালি অংশ দেখে যাত্রার পূর্বসূরি মনে হতে পারে। পাঁচালি থেকে পৌরাণিক পালা আর রঙ্-পাঁচালি থেকে সামাজিক পালা এসেছে হয়তো বা। আশুতোষ ভট্টাচার্যের লেখা বাংলার লোকসাহিত্য তৃতীয় খণ্ডে বোলানের পরবর্তী অংশ হিসাবে পাঁচালী ও রঙ্-পাঁচালির কথা আছে।

যাই হোক বিশ শতকের পেশাদার যাত্রাপালার অপরাজেয় কারিগর ছিলেন পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে। ফরিদপুরে ১৯০৭-এ জন্ম ব্রজেন্দ্রনাথের। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে লড়াই করে উঠে এসে তিনি বেলেঘাটা বাণী নাট্যসমাজে যোগ দেন। তাঁর সক্রিয় ভূমিকায় একটি শখের দল পেশাদার হয়ে ওঠে। তাঁর প্রথম যাত্রাপালা *স্বর্ণলঙ্কার* জন্যেই তিনি সুনাম অর্জন করেন। এরপর তিনি প্রকাশক-পালাকার ডায়মন্ড লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা কানাইলাল শীলের গণেশ অপেরার জন্য যাত্রা লিখতে শুরু করেন। সেখানেও তাঁর পালা একের-পর-এক হিট হতে শুরু করে।

তাঁর সাফল্যের মূল কারণ তিনি চালু যাত্রাপালাগুলির দুর্বলতা সহজে বুঝতে পেরেছিলেন: দীর্ঘ সংলাপ, অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় গান, ভাঁড়ামি, গতানুগতিক পৌরাণিক পালার প্রাধান্য, অদ্ভুত পোশাক-পরিচ্ছদ। এই ত্রুটিগুলি তিনি নিজের পালায় দূর করতে বদ্ধমূল হন। প্রথম দিকে বড়ো পালা লিখলেও তিনিই শেষ পর্যন্ত তিন-সাড়ে তিন ঘণ্টায় যাত্রাপালার অভিনয় শেষ করার বিষয়টি প্রবর্তন করেন। সার্থকভাবে ছোটো সংলাপ ব্যবহার করলেন *চাঁদের মেয়ে* (১৯৩৬) পালায়। এই পালাতেই শুরু হল গ্রুপ একটিং—লম্বা-লম্বা সংলাপের মধ্যে দিয়ে 'ক্ল্যাপ' পাওয়ার দিন শেষ হল। *দেবতার গ্রাস* পৌরাণিক পালা লিখতে গিয়ে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছেড়ে গদ্যভাষা ব্যবহার করতেই ভোল বদলে গেল পৌরাণিক পালার। চন্দ্রচূড় চরিত্রটির সৃষ্টি ও তার সংলাপের ভিতর দিয়ে যাত্রায় স্যাটায়ার, উইট, হিউমারের প্রয়োগ করলেন তিনি।

স্বর্ণলঙ্কা (১৯২৫), *রাক্ষসের দেশে* (১৯২৬), *মায়া* (১৯২৭), *বজ্রনাভ* (১৯৩১), *প্রবীরার্জ্জুন* (১৯৩২), *লীলাবসান* (১৯৩৪), *চাঁদের মেয়ে* (১৯৩৬), *রাজর্ষি বা দানবীর* (১৯৩৭), *যমে-মানুষে* (১৯৪১), *রাজনন্দিনী* (১৯৪২), *মহাযুদ্ধের বলি বা ইনকিলাব জিন্দাবাদ* (১৯৪৩), *আকালের দেশ* (১৯৪৩), *দেবতার গ্রাস* (১৯৪৫), *মায়ের ডাক* (১৯৪৫), *লোহার জাল* (১৯৬০), *বালির বাঁধ* (১৯৬০), *ধ্বংসের ডাক* (১৯৬০), *সোনাই দীঘি* (১৯৬০), *আঁধারের মুসাফির* (১৯৭২), *কলঙ্কিনী রাই* (১৯৭২), *নটী বিনোদিনী* (১৯৭৩), *কৃষ্ণ সুদামা* (১৯৭৩), *বিদ্রোহী নজরুল* (১৯৭৪), *ভারত পথিক রামমোহন* (১৯৭৪),

নন্দকুমারের ফাঁসি (১৯৭৫), *অনাথ জননী* (১৯৭৫), *ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য* (১৯৭৪) প্রভৃতি ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত বেশ ক-টি জনপ্রিয় যাত্রাপালা।

পশ্চিমভাগের পাশাপাশি বঙ্গদেশের পূর্বভাগেও যাত্রার জনপ্রিয়তাও ছিল চোখে পড়ার মতো। জলপথ প্রধান ছিল বলে প্রত্যেক যাত্রাদলের বড়ো-বড়ো নৌকা থাকত। প্রখ্যাত যাত্রানট সূর্য দত্তের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় যে সেদেশে মূলত দলের প্রধান কার্যালয় ছিল নৌকো। বিশাল-বিশাল নৌকো যেন একটা গোটা বাড়ি। নৌকোগুলো এতই পরিচিত ছিল যে, দেখেই বলা যেত, কোন্ দলের কোন্‌টি। বছরের সাত-আট মাস ওই ছিল যাত্রাশিল্পীদের ঘরবাড়ি। এক মোকাম থেকে আর এক মোকামের পথে নদীবক্ষে, নৌকাতেই চলত রিহার্সাল, গান-বাজনা।

এ সময়ের দলগুলো সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য না-থাকলেও বলা যায়, বিশ শতকে বরিশালে মুকুন্দ দাসই 'স্বদেশী যাত্রাপার্টি' তৈরি করলে তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে ঝালকাঠিতে গঠিত হয় নাগ-দত্ত-সিংহ-রায় কোম্পানি—ঝালকাঠির কৃষ্ণকাঠি গ্রামের রজনীকান্ত নাগ ও বাদলকাঠি গ্রামের মহেন্দ্রনাথ সিংহ এবং আরও দুই অধিকারীর কৌলিক পদবি 'দত্ত' ও 'রায়' অনুসারে এই দলের নাম রাখা হয়। এই দলে মুকুন্দ দাসের পালা ছাড়াও অহিভূষণ ভট্টাচার্যের *সুরথ উদ্ধার*, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর 'কুবলায়শ্ব' প্রভৃতি পালা পরিবেশিত হত। তবে দলটি দীর্ঘায়ু ছিল না। এ দলটি ভেঙে ১৯০৭-এ রজনীকান্ত নাগ ও মহেন্দ্রনাথ সিংহ মিলে গঠন করেন নাগ-সিংহ কোম্পানি, যেটি পরে আবার ভেঙে রজনী নাগের নাগ কোম্পানি ও মহেন্দ্র সিংহের

সিংহ কোম্পানিতে পরিণত হয় বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই। সিংহ কোম্পানিতে গায়ক ভূষণ দাস ছিলেন মোশান মাস্টার, আর সূর্য দত্ত ছিলেন শিশু অভিনেতা। একই সময় ফরিদপুরের নড়িয়ার মহেন্দ্রকুমার সেন আদি ভোলানাথ অপেরা নামের যে-দলটি গঠন করেন তার বেশ নামডাক হয়েছিল। ঝালকাঠি জেলার নলছিটির রজনীকান্ত চক্রবর্তী গঠন করেন ঠাকুর কোম্পানি (১৯০৯), যে-দলের পঁচিশ শতাংশ অংশীদার ছিলেন সেকালের অন্যতম প্রধান বায়েন মাছরঙ গ্রামের শশিভূষণ নট্ট। ১৯১০-এ ঢাকায় অয়বাবু যে-যাত্রাদল খোলেন সে-দল তাঁর নামেই পরিচিতি পায়। নোয়াখালিতে কেষ্টসাহার দল (মালিক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র সাহা), যশোরের নীলমাধবের দল (মালিক নীলমাধব মুখোপাধ্যায়), ঝালকাঠির মাছরঙ গ্রামের বৈকুণ্ঠনাথ নট্টের মাছরঙ বৈকুণ্ঠ নাট্য সমাজ (১৯১৪), বরিশালের পাষাণময়ী অপেরা (১৯১৬), বরিশালের বিল্বগ্রামের কালীচরণ নট্ট প্রতিষ্ঠিত বিল্বগ্রাম নট্টকোম্পানি (১৯১৮), নড়াইলের গৌরচন্দ্র প্রামাণিকের যাত্রাদল (১৯২০), ঝালকাঠির বৈকুণ্ঠনাথ নট্টের নট্টকোম্পানি যাত্রা পার্টি (১৯২৪), বরিশালের বানারিপাড়ার কালিয়দমন গুহঠাকুরের 'রণজিৎ অপেরা (১৯২৯), পটুয়াখালির মোজাহের আলি সিকদারের মুসলিম যাত্রা পার্টি (১৯৩০), ফরিদপুরের নবদ্বীপচন্দ্র সাহা শঙ্কর অপেরা পার্টি (১৯৩১) এবং নবদ্বীপচন্দ্র সাহা যাত্রাপার্টি (১৯৩১), ফরিদপুরের সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জাতীয় আনন্দ প্রতিষ্ঠান (১৯৩৪), মানিকগঞ্জের কার্তিকচন্দ্র সাহার অন্নপূর্ণা যাত্রা পার্টি (১৯৪৪), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জয়দুর্গা অপেরা (১৯৪৭) প্রভৃতি অবিভক্ত দেশে বেশ জনপ্রিয় ছিল।

মহিলারাও যাত্রাদল গঠনে পিছিয়ে ছিলেন না। ঝালকাঠিতে মহিলা পরিচালিত লেডি কোম্পানি (১৯১৫) বা 'বোঁচার দল' প্রথম মহিলা অধিকারীর দল। এছাড়াও মহিলা পরিচালিত বেশ কিছু দলের নাম জানা যায় তপন বাগচী-র 'যাত্রাগানে নারীর অংশগ্রহণ ও উপস্থাপন' প্রবন্ধ থেকে: বনশ্রী বাকচী (১নং দীপালি অপেরা, ১৯৭৩, গোপালগঞ্জ), শর্বরী দাশগুপ্তা (তুষার অপেরা, ১৯৭৪, যশোর), জ্যোৎস্না বিশ্বাস (চারণিক নাট্যগোষ্ঠী, ১৯৭৪, মানিকগঞ্জ), আয়েশা আখতার (কোহিনুর অপেরা, ১৯৭৬, মানিকগঞ্জ), আরতিরানি বিশ্বাস (আরতি অপেরা, ১৯৭৮, খুলনা), সানু আক্তার (রূপালী অপেরা, ১৯৭৯, কুমিল্লা), মমতাজ বেগম মায়া (ভাগ্যলিপি অপেরা, ১৯৮২, নোয়াখালী), বীণা বেগম (চাঁদনী অপেরা, ১৯৮৪, কুমিল্লা), সাকেলা বেগম (নিউ জয়ন্তী অপেরা, ১৯৮৬, মানিকগঞ্জ), আয়েশা আক্তার (সুমি নাট্যসংস্থা-২, ১৯৮৭, নরসিংদী), শিপ্রা সরকার উমা (নিউ প্রতিমা অপেরা, ১৯৮৭, মানিকগঞ্জ), মিনতি বসু (নাট্যমঞ্জরী যাত্রা ইউনিট, ১৯৮৯, সাতক্ষীরা), কৃষ্ণারানী চক্রবর্তী (রামকৃষ্ণ যাত্রা ইউনিট ১৯৯১, বাগেরহাট), পারভীন জামান (আদি বঙ্গশ্রী অপেরা, ১৯৯২, ফরিদপুর) এবং নার্গিস আক্তার লিপি (তাজমহল অপেরা, ১৯৯৭, শরিয়তপুর)।

একই প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের ২১৫টি দলের মধ্যে নামকরণে নারীবাচক শব্দের আধিক্যও তুলে ধরেছেন: যেমন, লেডি কোম্পানি, পাষাণময়ী অপেরা, অন্নপূর্ণা যাত্রা পার্টি, জয়দুর্গা অপেরা, বাসন্তী মুক্তমঞ্চ নাট্যপ্রতিষ্ঠান, ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরা, রাজলক্ষ্মী অপেরা, গীতশ্রী যাত্রা ইউনিট, নিউ বাসন্তী

অপেরা, দীপালি অপেরা, জয়শ্রী অপেরা, কোহিনুর অপেরা, রূপশ্রী অপেরা, শিরিন যাত্রা ইউনিট, জোনাকী অপেরা, আদি মিতালী অপেরা, বিজয়লক্ষ্মী অপেরা, বিশ্বরূপা অপেরা, বাণীশ্রী মুক্তমঞ্চ নাট্যপ্রতিষ্ঠান, বঙ্গশ্রী অপেরা, গীতাঞ্জলি অপেরা, জ্যোৎস্না অপেরা, বৈকালী অপেরা, আনন্দময়ী অপেরা পার্টি, বঙ্গলক্ষ্মী অপেরা, সাধনা অপেরা, আরতি অপেরা, দি গীতাঞ্জলি অপেরা, রূপালী যাত্রা পার্টি, চলন্তিকা নাট্যসংস্থা, রূপাঞ্জলি নাট্যসংস্থা, ভাগ্যলিপি অপেরা প্রভৃতি।

এই কথা বলতে গিয়ে একটা বিষয় নজরে আসে, যাত্রাদলের নামে এই 'অপেরা' শব্দটি— আগেকার মতো আজও নব্বই শতাংশ যাত্রাদলের নামের সঙ্গে 'অপেরা' শব্দটি জোড়া আছে, এই প্রসঙ্গে, সাধনকুমার ভট্টাচার্যের অপেরা-র সঙ্গে যাত্রার তুলনামূলক আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলছেন, "আমাদের পাঁচালী পালাগানকে ইংরেজীতে "আসরে অভিনীত অপেরা" বলা যেতে পারে। যাত্রার বদলে অপেরা শব্দটি প্রয়োগ করতে গেলে 'আসরে-অভিনীত' বিশেষণটি ব্যবহার করা দরকার। কারণ যাত্রা নাটক সাধারণত আসরেই অভিনীত হয়ে থাকে, আর অপেরা অভিনীত হয় অপেরাহাউসে—দৃশ্যপট সহযোগে। অবশ্য অপেরারও প্রথম রূপের প্রতিনিধি এরা। এই পালাগানের অভিনয়ের আগে কথকতা ও পাঁচালীগানে যাত্রার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। তবে যাত্রা বা অপেরা, এই গীতিসর্বস্ব প্রথমরূপেই আত্মপ্রকাশ শেষ করে দেয়নি। এদেরও জীবনে বিবর্তন ঘটেছে এবং সনাতন নীতির নিয়মেই তা ঘটেছে।

নাট্যসাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে এই ইতিহাসের বেশ সাদৃশ্য আছে। সমালোচক মোলটন লিরিক-ট্র্যাজেডির বিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে যে কথাটি বলেছেন ... dramatic spirit struggles to break through the lyric form in which it is restrained... সেই কথাটিই এখানে প্রযোজ্য। যাত্রা শুধু বিষয়বস্তুর নির্ধারিত সীমাই অতিক্রম করতে চেষ্টা করেছে তা নয়—কাহিনি রচনায় ও রসসৃষ্টিতে সংলাপের মাত্রাও বাড়িয়ে দিয়েছে তথা গান ও সংলাপ এই দু-টি উপাদানকেই প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিষয়বস্তু যেমন ক্রমশ পৌরাণিক স্তর অতিক্রম করে ঐতিহাসিক ও সামাজিক স্তরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, সংলাপের মাত্রাও নাটকের কাছাকাছি পৌছে গেছে। যাত্রা ও অপেরার বিষয়বস্তু প্রায় একরকম। অপেরার বিষয়বস্তুও সাধারণত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক—The majority of operas deal with what we should roughly describe as classical or romantic subjects—stories from ancient Greek Mythology, from remote ages and countries such as Egypt or Japan from medieval history or from any period that is not our own—'Opera'.

ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলিশ অপেরার মতো যাত্রা,—was never anything more than a romantic play with a great deal of incidental music.—গীতিবহুল রোম্যান্টিক নাটকে পর্যবসিত হয়ে গেছে। এই শ্রেণির যাত্রায় সংলাপ ও সংগীত রসসৃষ্টিতে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। সংলাপ যে ভাবকে উদ্রিক্ত করে সংগীত সেই ভাবকে সুরের তীব্র উদ্দীপনা

দ্বারা সমগ্র দর্শক পরিমণ্ডলের শেষ সীমা পর্যন্ত সঞ্চারিত করে দেয়। এই কারণেই যাত্রা-নাটকে সংগীত সংলাপের অপরিহার্য পরিপূরক। আসরে-অভিনয়ে নাটকে সংগীত যোজনা কেবল প্রাচীন প্রথার অনুবর্তন মাত্র নয়, রস-সঞ্চারের অপরিহার্য উপকরণ বা উপায়। যাত্রায় এই উপায়টিকে নানাভাবে প্রয়োগ করা হয়—অবশ্য মঞ্চাভিনয়েও যে কোন কোন ভাবে না করা হয় তা নয়। এই উপায়-আসরস্থ যন্ত্রসংগীত (অপেরার অর্কেস্ট্রা), জুড়িগান (বালকদের সমবেত গীত), পাত্রপাত্রীর গান এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বিবেকগীতি (গ্রীসের কোরাস নায়কের সঙ্গে বিবেকের সাদৃশ্য লক্ষণীয়) আসরস্থ বা নেপথ্য যন্ত্রসংগীত দ্বারা উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুধু যাত্রাভিনয়ে বা অপেরাভিনয়েই থাকে তা নয়। নাটকের অভিনয়েও এই উপায়টি অতীতে কমবেশী প্রযুক্ত হয়েছে, বর্তমানেও কিছু কিছু হয়ে থাকে।" (*নাট্যতত্ত্বমীমাংসা* পৃ. ৪৫১-৫২)

১৯৪৭-এ স্বাধীনতা ও দেশভাগের স্মৃতি নিয়ে যাত্রাগান রচিত হলেও মানুষের মনে থেকে গিয়েছিল এক দগদগে ক্ষত। তবে যাত্রার প্রসার কমেনি, জনমোহিনী ক্ষমতায় যাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায়। ষষ্ঠী থেকে জষ্ঠি চলত নানা 'কল শো'। প্রতি জেলায় দল থাকলেও বাইরের জেলা থেকে বিশেষত কলকাতার চিৎপুর থেকে দল আনার জন্য রেষরেষি পড়ত। পুজো-পার্বণ-মেলা-মোচ্ছবে আগে যেমন যাত্রা হত পাড়া-মহল্লা বা পাশের অঞ্চলের দলকে ডেকে, ট্যাঁকের জোর বাড়ার পর সেখানে বাইরের নামজাদা অভিনেতা (গায়ক-নায়ক ছায়াছবিখ্যাত হলে তো

কথাই নেই) ও অভিনেত্রী (দুষ্টমিষ্টি বলাই বাহুল্য) সমৃদ্ধ দলের পালা (অবশ্যই নাচে-গানে ভরপুর মনমাতানো সামাজিক পালা) আসতে শুরু করল। রেলপথের স্টেশনগুলোতে মফস্‌সলের যাত্রাদলের আড্ডা ছিল বহুদিন পর্যন্ত। আজ থেকে বছর দশেক আগেও শিয়ালদা মেন লাইনের রানাঘাট শাখার চাকদা স্টেশনে যাত্রাদলের কার্যালয় থেকে সাজঘরের লাইন দেখলে গাঁ-ঘরে যাত্রার জনপ্রিয়তার আন্দাজ পাওয়া যেত।

মানুষ অপেক্ষা করে থাকত কী নতুন পালা নিয়ে আসছে সত্যম্বর অপেরা, নট্ট কোম্পানি, বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজ, রঞ্জন অপেরা, নব রঞ্জন অপেরা, বীণাপাণি অপেরা, নিউ গণেশ অপেরা, তরুণ অপেরা, শান্তিগোপাল অপেরা, নিউ প্রভাস অপেরা, আর্য অপেরা, অম্বিকা নাট্য কোম্পানি, অলিম্পিক অপেরা, ভারতী অপেরা, সত্যনারায়ণ অপেরা, লোকনাট্য, গণনাট্য, তপোবন নাট্য কোম্পানি, আনন্দলোক, শিবদুর্গা অপেরা, নব নাথ কোম্পানি, দি ভাণ্ডারী অপেরা, গুরুদাসী নাট্যম, রিক্তা নাট্য কোম্পানি, স্টার অপেরা, ক্যালকাটা অপেরা, রঙ্গভারতী, দি ক্যালকাটা মিলনবীথি অপেরা, নব চিত্তরঞ্জন অপেরা, নব যুগ নাট্য কোম্পানি, রামকৃষ্ণ অপেরা, নিউ শঙ্করী অপেরা, যোগমায়া অপেরা, কোহিনূর অপেরা ইত্যাদি দলগুলো।

তাঁরা চোখ রাখতেন সংবাদপত্রের পাতায়। যাত্রার ইতিহাস দেখলেই জানা যায়, যাত্রার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে উনিশ শতক থেকেই। কিন্তু স্বাধীনতার পর বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকের শেষে ও ছয়ের দশকের গোড়ায় যাত্রার বিশেষ বাণিজ্যিক সাফল্যে 'আনন্দবাজার' ও 'যুগান্তর'-এর মতো

দৈনিকের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে নেপথ্যে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র সন্তোষকুমার ঘোষ ও সম্মুখে যাত্রাবন্ধু প্রবোধবন্ধু অধিকারীর ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য। চালু হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-র পাতায় ‘আনন্দলোক’ নামের একটি বিভাগ। সন্তোষ ঘোষের বয়ানে: “[...] প্রবোধের চেষ্টাতেই ‘আনন্দলোক’ বিভাগটি পুরোপুরি ‘যাত্রা’র হয়ে গিয়েছিল।”

তবে ‘আনন্দলোক’ পাতাটির জন্মের আগে থেকেই অন্ধকার থেকে প্রচারের আলোয় আসতে যাত্রাদলের মালিক-অধিকারীরা দৈনিকের পাতায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিতেন। যাত্রার মরশুম যেহেতু ছিল ষষ্ঠী থেকে জষ্ঠি তাই পুজোর আগেই বিজ্ঞাপন প্রথমে বেশি থাকত। গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ *যাত্রাশিল্পের ইতিহাস*-এ দেখিয়েছেন ১৯৫৯-এর ১৫ সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় নাথ কোম্পানির বিজ্ঞাপন:

নাথ কোম্পানী
থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টী
সত্বাধিকারিঃ শঙ্করলাল সাহা
পৃষ্ঠপোষকঃ জীবনকৃষ্ণ দাস

—শ্রেষ্ঠাংশে—

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, সত্য পাঠক, পালান নস্কর, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়,
ললিত রায়, অমূল্য ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ রায় (গায়ক)
স্ত্রী চরিত্রেঃ নিতাই গাঙ্গুলী, মধু দেবনাথ, কানন ঘোষ, বনফুল [...]

১৯৫৯-এর ২৫ অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপন পাতায় আর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল:

দি ক্যালকাটা অপেরা

রেঃ নং ৩২৯০১ ৩৩১, আপার চিৎপুর রোড। কলিকাতা।

যাত্রাজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নট

শ্রীফণীভূষণ মতিলাল (ছোট ফণী)

শ্রেষ্ঠ প্রধান নট **প্রভাত বোস** তৎসহ

নিমাই চৌধুরী ও মঞ্জুশ্রী

ব্র্যাঞ্চ অফিসঃআসানসোল (শান্তি নিবাস বোর্ডিং) আসানসোল বুকিং এজেন্ট রজনী ভাণ্ডারী

২২ জানুয়ারি ১৯৬৬০ তারিখের 'আনন্দবাজার'-র বিজ্ঞাপনের পাতায় সত্যম্বর অপেরার ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন ছিল:

করিমগঞ্জে

কলিকাতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী

সত্যম্বর অপেরা

১০ই মাঘ হইতে ৭ দিনের জন্য করিমগঞ্জ টাউনে আসিতেছে

প্রথম রজনী

রাজা লক্ষ্মণ সেন

পূর্ব হইতে টিকিট সংগ্রহ করুন

—প্রযোজক —এন. সি. সাহা

এই বিজ্ঞাপন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, বিজ্ঞাপনটি সত্যম্বর অপেরার কর্তৃপক্ষ দেননি, যাঁরা বায়না করেছিলেন অর্থাৎ করিমগঞ্জের এন. সি. সাহা দিয়েছিলেন।

'আনন্দবাজার'-এ যাত্রার বিজ্ঞাপনে ১৪ এপ্রিল ১৯৬০ আমরা দেখতে পাই:

নববর্ষে

সত্যম্বর অপেরা

সমগ্র দেশবাসীকে জানাচ্ছে তার সাদর সম্ভাষণ

নববর্ষের নব আকর্ষণ

সপ্তর্ষি ও

ব্রজেন বাবুর

সোনাই দীঘি

৩৪৭।১নং আপার চিৎপুর রোড। কলিকাতা-৬

এরপর ১৯৬০-এর ২৪ জুন 'নাট্যলোক ও চিত্রকথা' পৃষ্ঠায় কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত একটি ছোট্ট নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সেটি ছিল এই রকম:

"সৌখিন সম্প্রদায়ের নাট্যাভিনয় এবং অন্যান্য
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিবরণ আগামী সপ্তাহ
থেকে শুক্রবার নাট্যলোক ও চিত্রকথা বিভাগের
পরিবর্তে অন্য একদিন বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ
করার ব্যবস্থা হয়েছে।"

সেটিই 'আনন্দবাজার'-এর পাতায় ৩০ জুন ১৯৬০ 'আনন্দলোক' বিভাগটির সূচনার বার্তা বহন দিয়েছিল।

১৯৬০-এর ৯ অক্টোবর প্রকাশিত হয় 'নিউ রয়েল বীণাপাণি' অপেরার বিজ্ঞাপন :

নিউ রয়েল বীণাপাণি

প্রোঃ নারান ভট্টাচার্য—কালিপদ সরকার

ব্রাঞ্চ অফিস

অবন্তিকা হোটেল

এবারের নাট্যার্ঘ্য

ব্রজেন দের

ভাগ্যের বলি • বালির বাঁধ

সৌরীণ বাবুর

মহিষাসুর • লালা বাঈ • রঘু ডাকাত

শ্রেষ্ঠাংশে

ভোলানাথ পাল/ পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়/বিজয় ভদ্র

পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়/পশুপতি কুণ্ডু (ফিল্ম)

বীণা ঘোষ/নমিতা দাস

রূপকুমার

পরিচালকঃ শম্ভুনাথ ঘোষ

১৯৬০-এর ৯ অক্টোবর সত্যম্বর অপেরার আর একটি প্রকাশিত ছোটো বিজ্ঞাপনের নমুনা :

এ বছর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

সত্যম্বর অপেরা

প্রো : গৌরচন্দ্র দাস

ফোন ঃ ৫৫-১০৫৩

সোনাই দীঘি • পুষ্পচন্দন

অদ্য শুভ উদ্বোধন।

ব্রাঞ্চ অফিস : তৃপ্তি বোর্ডিং (আসানসোল)

তত্ত্বাবোধায়কঃ হরিপদ বায়েন

এই একই তারিখে খুব বড়ো বিজ্ঞাপন দিয়েছিল অম্বিকা নাট্য কোম্পানি :

অম্বিকা নাট্য কোম্পানী

১১৭।১ অপার চিৎপুর রোড। কলিকাতা-৬

দর্শকদের চিত্ত জয় করে চলেছে

সোরাব রুস্তম • শয়তানের চর • ছিন্নতার

প্রায়শ্চিত্ত • সতী তুলসী • প্রেত মানব

জয়দেব • প্রতিশোধ

৩রা কার্ত্তিক হইতে আসানসোলে হিন্দ মেডিকেল স্টোর্সে

অভয়পদ বসুর সঙ্গে বুকিং-এর ব্যাপারে যোগাযোগ করুন।

—বিশেষ ঘোষণা —

বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে গত ১লা আশ্বিন সোরাব রুস্তম নাটকটির
অভিনয় সম্পর্কে তৃপ্তি মিত্র, অসিতবরণ, তরুণকুমার,
বিধায়ক ভট্টাচার্যের মতামত নাম সহ ছাপা হয়েছিল।
কালীয়দমন গুহঠাকুরতাঃ ম্যানেজার
অশ্বিনীকুমার দাসঃ এ্যাঃ ম্যানেজার

যাত্রাপালাগুলি নিয়ে বিখ্যাত মানুষদের মতামত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার করার রেওয়াজ থাকলেও, একথা স্বীকার করতে হবে অম্বিকা অপেরাই এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শক। আবার এক সঙ্গে আটখানি পালা আসরে নামানোর নজিরও বোধ করি এই প্রথম।

১৯৬০ সালের ২৫ ডিসেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সি সত্যম্বর অপেরার একটি বড়ো বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হয়:

আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ
অক্লান্ত চেষ্টায়, বহু অর্থ ব্যয়ে কাছাড় জেলায় মাত্র ২টি
আসরে অভিনয় করাইবার জন্য আনাইতেছি
বছরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র খ্যাত **"সোনাই দীঘি"** সম্প্রদায়
সত্যম্বর অপেরা।
১। শিলচর গোল দীঘির মাঠ—-২৭ শে পৌষ হইতে ৬ই মাঘ মাত্র ১০ দিনের জন্য
পরিবেশক : সুবিনয় এন্দা
২। করিমগঞ্জ পাবলিক হাইস্কুল প্রাঙ্গণ ঃ ৮ই হইতে ১৭ই মাঘ মাত্র ১০ দিনের জন্য
পরিবেশকঃ এন. সি সাহা
সর্ব্বত্র উদ্বোধন রজনীতে অভিনয় হইবে
ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত
সোনাই দীঘি
যুগ্মনিবেদক
শ্রীসুবিনয় এন্দা, এন, সি সাহা

১৫ অগষ্ট ১৯৬১-তে 'আনন্দবাজার' যে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে, তা-তে যাত্রাদালের প্রকাশিত কয়েকটি বিজ্ঞাপন:

১৪তম শুভ স্বাধীনতা দিবসে আজও আপনার ও
দশের আনন্দদানে নিয়োজিত কলিকাতার
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাত্রাপার্টী
তরুণ অপেরা
শ্রেষ্ঠাংশেঃ **নটসম্রাট ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ**
ও
বাবলি রাণী
প্রখ্যাত হাস্যরসিকঃ **নবদ্বীপ হালদার**
কোলিয়ারী পরিচালক — ১১৩ আপার চিৎপুর রোড
অভয় বসু — কলিকাতা-৬

আর ছিল:

ঝুলন উৎসব উপলক্ষ্যে
নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা
যাত্রাভিনয়ে বিরাট আয়োজন
৬, ৭, ৯ই ভাদ্র (১৩৬৮) রাত্রি ১১ টায়
জিয়াগঞ্জ (নেহালিয়া ভবন) মুর্শিদাবাদ
১১ই, ১২ই ভাদ্র (নবদ্বীপ বাজার) রাত্রি ১০টা

তবুও যাত্রার বিজ্ঞাপনের কথা বললেই বিশেষত রথের দিনের কথাই মনে পড়ে। কারণ হিসেবে বলা যায় যা গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ তাঁর *যাত্রা শিল্পের ইতিহাস* গ্রন্থে (পৃ ১৯-২০) বলেছেন, "আমাদের কাছে যেমন দুর্গোৎসব, তেমনি 'যাত্রা' শিল্প বা বর্তমান চিৎপুর অঞ্চলের যাত্রার ক্ষেত্রে পবিত্র দিন হলো রথযাত্রা। দল বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটন, পালা বায়না, নতুন পালার সূচনা, পালার গানে সুর বসানো

ইত্যাদি যা কিছু শুভ কাজ অর্থাৎ যাত্রার 'নববর্ষবরণ' বলতে যা বোঝায় সবই এই রথযাত্রার দিনে অনুষ্ঠিত হয়। ইদানীং যদিও নব্য প্রযোজকরা বা যাত্রার সঙ্গে জড়িত সকলে ১লা বৈশাখ, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি দিনে এই সব শুভ কাজ করে থাকেন, তবুও রথযাত্রার দিনটিকে যাত্রাপল্লী চিৎপুরে আলাদা একটা বিশেষ দিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রশ্ন জাগে, কেন রথযাত্রার দিনটিকে বিশেষভাবে আজও চিহ্নিত করে রেখেছে যাত্রা জগতের মানুষেরা। এ প্রসঙ্গে একটু আলোকপাত করা যাক—অতি প্রাচীনকালে গ্রহদের মধ্যে সূর্যকেই প্রধান ও উজ্জ্বলতম গ্রহ হিসেবে মানা হতো। পৃথিবীর বহু জাতি তাই আজও সূর্যের উপাসনা করে থাকে। কৃষিজীবি সমাজের কাছে সূর্যের উত্তরায়ণ অপেক্ষা দক্ষিণায়নের দাম অনেক। এর কারণ গ্রীষ্মের অবসান ও বর্ষার সূচনা। এই সময়ের মধ্যে কৃষকরা তাদের কৃষিজাত যা কিছু ফসল ঘরে তুলতেন। এই সময়ে পূর্বভারতে যে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব পালন করা হতো তাকে বলা হতো সূর্যোৎসব। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের 'সুর্য-যাত্রা'কে বলে দক্ষিণায়ন। শীতপ্রধান দেশে সুর্য-যাত্রাকে বলে উত্তরায়ণ; সুতরাং এ সব দেশে সূর্যোৎসবই প্রধান। পাশ্চাত্য দেশে যেমন 'বড়দিন', তেমনি এদেশে বিশেষ করে উড়িষ্যায় শ্রেষ্ঠ উৎসব রথযাত্রা। অবিভক্ত বাংলাদেশেও তাই রথযাত্রা উৎসবের আলাদা একটা চেহারা বা ঐতিহ্য আজও বজায় আছে। এই রথযাত্রা সূর্যের দক্ষিণায়ন উৎসব নামে খ্যাত। ধর্মের প্রশ্নে, হিন্দুধর্মের অন্যতম উৎসব হলো রথযাত্রা, কারণ দেবতার রথযোগে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া।

দেবতাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার ক্ষেত্রে যে উৎসব পালিত হয় তাকেও ‘যাত্রা’ বলে। আর সেই কারণেই বোধ হয় রথযাত্রার দিনটি যাত্রার সঙ্গে জড়িত সকলের কাছেই এক পবিত্র দিন।”

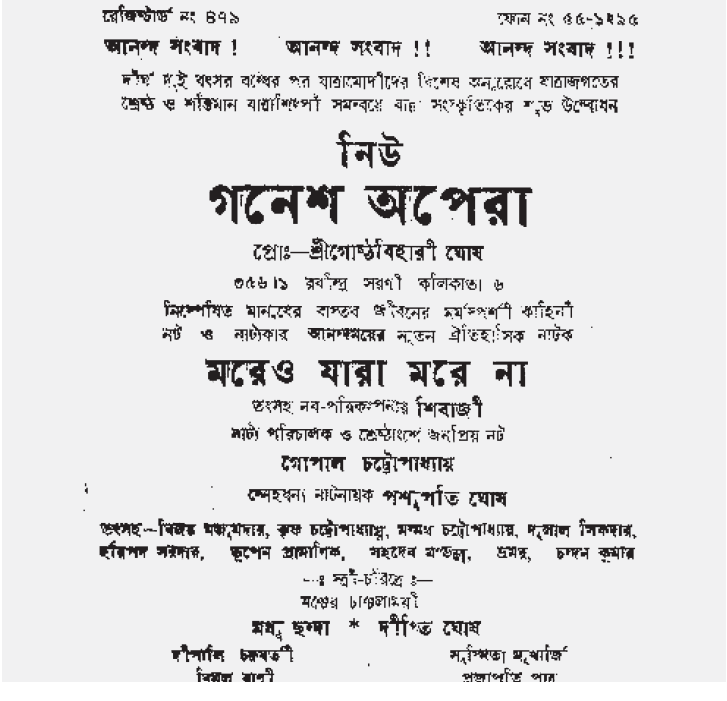

‘আনন্দবাজার’-এর পাতায় রথের দিন যাত্রার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত যেমন হত, তেমনই পাতা-জোড়া বিজ্ঞাপন বেরত ‘যুগান্তর’ ও অন্যান্য দৈনিকে। প্রথমে সে বিজ্ঞাপনে থাকত না কোনো ছবি, শুধু শব্দের মারপ্যাঁচেই কাজ চালানো হত। যেমন ১৬ জুলাই ১৯৬৯ ‘যুগান্তর’-এর ছয়ের পাতায় যাত্রার বিজ্ঞাপনে গণেশ অপেরা জানান দিয়েছিল *তাদের মরেও যারা*

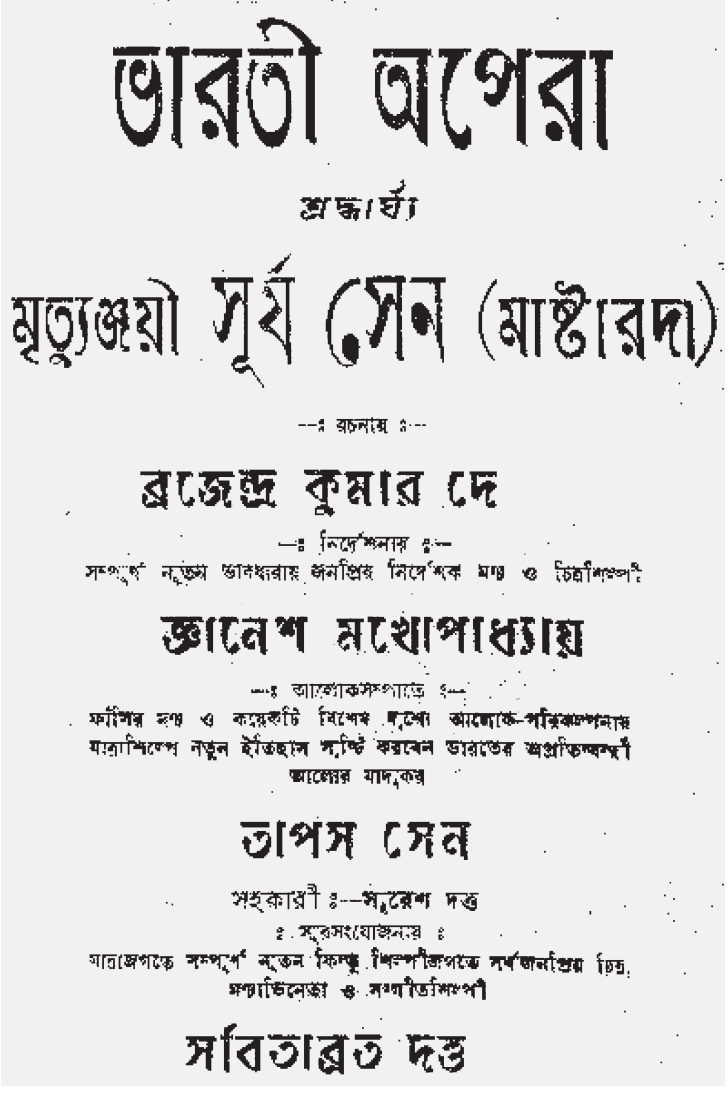

মরে না পালাটি 'নিষ্পেষিত মানুষের বাস্তব জীবনের মর্মস্পর্শী কাহিনী'। ভারতী অপেরা *মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন* (*মাষ্টারদা*) পালায় ফাঁসির মঞ্চ ও বিশেষ কয়েকটি দৃশ্যে আলোক-পরিকল্পনায় আলোর জাদুকর তাপস সেনের নতুন ইতিহাস সৃষ্টির কথা ঘোষণা করেছিল। শ্রীমা নাট্য কোম্পানী পালার প্রচারের সঙ্গে-

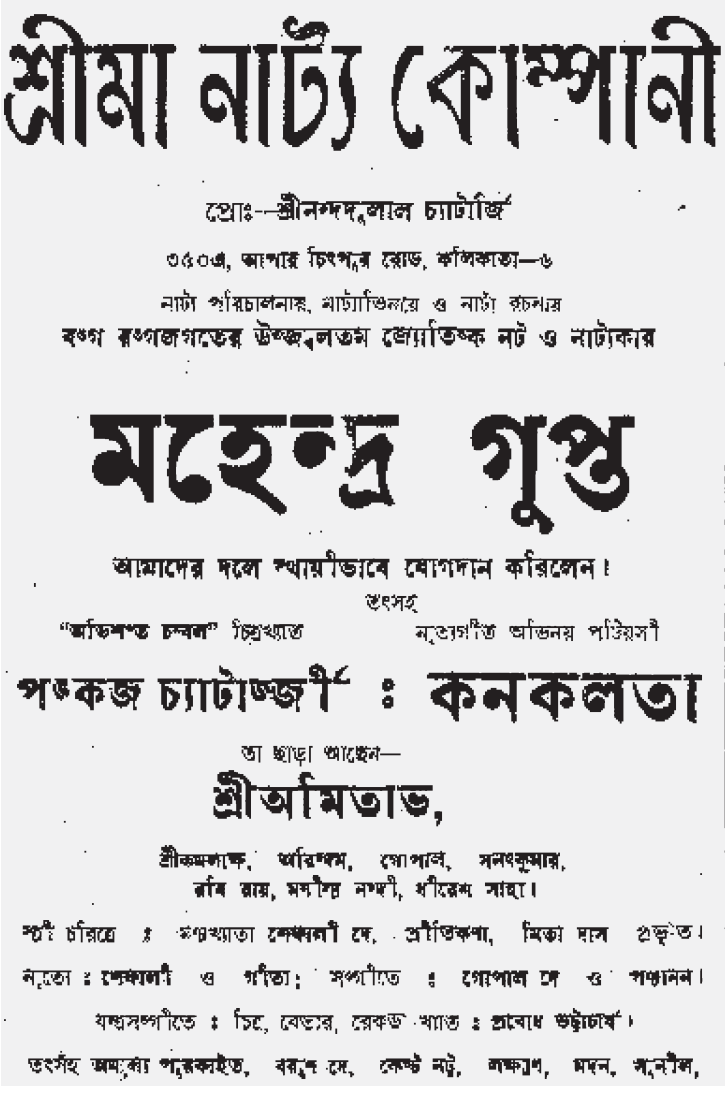

সঙ্গে তাদের দলে স্থায়ীভাবে মহেন্দ্র গুপ্তের যোগদানের খবর দিয়েছিল। ১৯৭০ বা ১৯৭১-এ রথের দিন ওই কাগজের পাতায় যাত্রার বিজ্ঞাপনের চিত্রটা ছিল একই রকম—পালা আর দলের নামের পরিবর্তন ছিল কিছু। ১৯৭৩-এর ২ জুলাই একই সংবাদপত্রের ছয়ের পাতায় যাত্রার বিজ্ঞাপনে ছবির ব্যবহার

দেখতে পাওয়া যায়—শিল্পতীর্থের *নটী বিনোদিনী* ও নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার *দালিয়ার* ক্ষেত্রে। ১৯৭৪-এ রথের দিন ২২

শুভ রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে দৃপ্ত ঘোষণা

কবিগুরুর কাহিনী অবলম্বনে

দালিয়া

যাত্রারূপ - নরেশ চক্রবর্তী

সুর : অনল চট্টোপাধ্যায়

নির্দেশনা ও বিশিষ্ট একটি চরিত্রে

? ? ? তৎসহ

জ্যোতি দত্ত : অজিত সাহা : আনন্দ রায় : চণ্ডী ব্যানার্জি : অচীন মৈত্র শতদল। সঙ্গীতে : অনলকুমার। নৃত্যে : বৈদ্যনাথ, কাশীনাথ, শ্যামলকুমার, শান্তি, বলদেব। স্ত্রী চরিত্রে : বেলা সরকার, বিথীকা কর, শেফালী (মানা), মিনতি উজ্জ্বলা, সুজলা শেফালী গাঙ্গুলী এবং শৈবালকুমার ও জয়ন্তকুমার

সভ্যতার নগ্ন ইতিহাস!

জীবন মরণ

কাহিনী - ফাল্গুনী • নাটক - চণ্ডী ব্যানার্জী

পরিবেশনায় :

নিউ রয়েল বীণাপানী অপেরা

১১৭, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা—৬ ফোন : ৫৫-৭৫৫২

ম্যানেজার : মৃত্যুঞ্জয় পান্ডা

কার্যাধ্যক্ষ : সুদাম চক্রবর্তী

সহঃ-কার্যাধ্যক্ষ সুকুমার দাস

সর্বাধিনায়ক : সন্তোষ চক্রবর্তী   পরিচালক : মুকুল কর

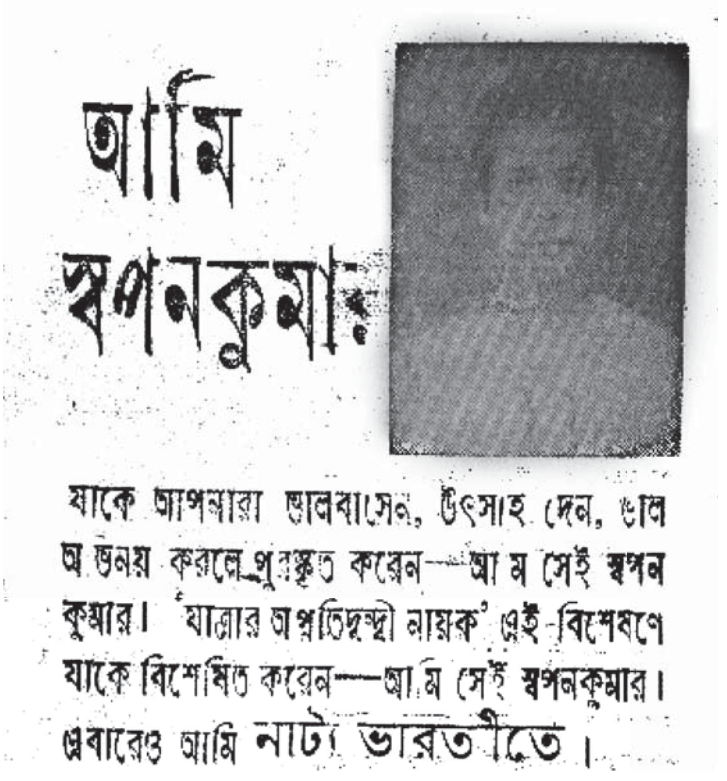

জুন নাট্য ভারতী স্বপনকুমারের ছবি ছেপে বিজ্ঞাপন দেয় তাঁর বয়ানসহ: "আমি স্বপনকুমার/ যাকে আপনারা ভালোবাসেন, উৎসাহ দেন, ভাল অভিনয় করলে পুরস্কৃত করেন—আমি সেই স্বপনকুমার। 'যাত্রার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক' এই বিশেষণে যাকে বিশেষিত করেন—আমি সেই স্বপনকুমার। এবারও আমি নাট্য ভারতীতে।" ছবি ছাপা হয়েছিল দিলীপ কুমার ও মধুশ্রী দেবীর তপোবন নাট্য কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে। ১৯৭৫ থেকে ছবিসহ যাত্রার বিজ্ঞাপন মুদ্রণের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বৃদ্ধি পায় রথের

রথযাত্রার পুণ্য লগ্নে লহ নমস্কার

তপোবন

নাট্য কোম্পানী ৩৪৬/৫, রবীন্দ্র সরণী • ৫৫-৩০০১

৮১'তে আগন্তুকের আবার দুঃসাহসিক নিবেদন

দিলীপ কুমার

মধুশ্রী দেবী

—ঃ অভিনীত সামাজিক নাটকযুগল ঃ—

আগন্তুকের
অন্ধ নিয়তি

কথা ও সুর ঃ
পঞ্চানন মিত্র

আগন্তুক রচিত
হারিয়ে নিজেরে খুঁজি

অজিত মুখার্জী - শৈবালকুমার
দেবজিৎ - শচীনগোস্বামী

যুগদেবতা

রচনা ঃ কমলেশ ব্যানার্জী
সুর ঃ অমিয় ভট্টাচার্য

তৎসহ ঃ অশোককুমার * সুনীল সমাদ্দার * জহর
বলরাম * বিজয় * মনোরঞ্জন * সুনীল ভট্টা ও মণি রায়

কেয়া রয় - প্রীতিকণা - চৈতালী - শেফালী গাঙ্গুলী

সংগীতে ঃ— হাস্যে ঃ— নৃত্যে ঃ—

সুধীর ধাড়া - সুধাংশু বারিক - ব্রজনাথ শঙ্কর ও মিস "বর্ব"

নাট্য নির্দেশনা—
দিলীপকুমার

নৃত্যপরিকল্পনায়
মধুশ্রী দেবী

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীদুলাল চট্টোপাধ্যায়

পরিচালক ঃ—
শ্রীমুকুল দত্ত

জনতার ডাকে ফিরে এসেছি

জনতা অপেরায়

শ্যামল চক্রবর্তী ... পরিতোষ রায়

পৃষ্ঠপোষক : সুশীল ভট্টাচার্য
উপদেষ্টা : মধুরা মিশ্র

৩৩৩/১ রবীন্দ্র সরণী কলিকাতা-৬

হঠাৎ আলোর ঝলকানি...
আতঙ্কের তীব্রতায়
সারা মুখ সাদা...
চোখের কোণায় জল...
আতঙ্ক!
ভয়াল
ভয়ঙ্কর...

আজও মানুষ সমাজের কিছু কিছু জল রয়েছে। ... মানব দরদের কাছে মজা আর ফূর্তির উপকরণ বলতে একটাই

বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে

স্ত্রী

নাট্যরূপ : কুণাল মুখার্জী
পরিচালনায় : যাত্রা জগতের গর্ব স্বপনকুমার
সুর : পশুপতি ভট্টাচার্য (বম্বে)

স্বপনকুমারের

স্বপ্নে এসেছি একটি উপন্যাসে ...

স্বপ্নাকুমারী

সত্যপ্রকাশ দত্তের

[illegible]

পরিচালনায় : যাত্রা জগতের গর্ব স্বপনকুমার
সুর : কালীপদ সেন

... মধু মল্লিক - স্বামানন্দ চক্রবর্তী - শান্তি ঘোষাল - প্রবীরকুমার - মনোজকুমার
বিশ্বনাথ বন্দ্যো: - অনন্তকুমার - কৃষ্ণকান্ত রায় - কুমার চ্যাটার্জি - দক্ষিণারঞ্জন
... শান্ত - কার্তিককুমার - রাম ভট্টাচার্য - হিমাংশু বন্দ্যো: - দিলীপকুমার
রাধেশ্যাম
গানে—দেবকুমার মুখার্জী - মাঃ অসীমকুমার - মীনা ব্যানার্জী - মৌসুমী সাহা
... ঘোষ - নীলিমা সেন - নৃত্যে—নমিতা নন্দী - নেপথ্যে—অনিল নট্ট - রঞ্জিত
কর্মকার - হরিপদ নন্দী - অনিল নন্দী - মুরারী অধিকারী - রাম নট্ট - সুধীর
নাগ - স্বপন সরকার - সত্যরঞ্জন - শংকর দে - ম্যানেজার—কালীপদ পাঠক, শান্তি দাঁ
দেবব্রত দেব - বিপিন মাজী - সাজসজ্জা—রানী দাশগুপ্ত - সংযোজক : চিত্ত রায়
প্রচার—শিশির সেন -

আজকের যাত্রার এই ঐতিহাসিক জয়যাত্রার

পথিকৃৎ তরুণ অপেরার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা

৫৫-৭১২১

ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে এই স্মরণীয় চরিত্রগুলি মঞ্চে জীবন্ত করেছে যাঁর বিরল প্রতিভা

শম্ভু বাগ রচিত
ক্রীতদাস
সুর-প্রশান্ত ভট্টাচার্য

মহর্ষি বিনয়কৃষ্ণের
বলিদান
... সুর-দুর্গা সেন

'তরুণ অপেরা'র সেই অদ্বিতীয় অভিনেতা ও পরিচালক
যাত্রাযুগসূর্য্য
শান্তিগোপালের
নির্দেশনা ও অভিনয় রূপায়িত হচ্ছে

সঙ্গে থাকছেন যাঁরা

[illegible]

আনন্দলোকের
আনন্দমেলায়
আপনাদের জানাই
আমন্ত্রণ

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের রহস্য ও রোমাঞ্চ
মায়ামৃগ
সুর : প্রশান্ত ভট্টাচার্য
নাট্যরূপ ও নির্দেশনা সূর্যসারথি

কমলেশ ব্যানার্জির
শাঁখা দিওনা ভেঙে
সুর : প্রশান্ত ভট্টাচার্য

নন্দ চৌধুরীর
পাণ্ডব বিজয়
সুর : পঞ্চানন মিত্র

অভিনয়ে
মহানায়ক/সুজিত পাঠক
নটনায়ক/দ্বিজু ভাওয়াল
হাস্যসম্রাট/রাধারমন পাল
সংগীত সুধাকর
জলদকুমার
... চৌধুরী, শ্যামল দাস ...
বীণা ঘোষ/মধুচন্দা
অপ্সরা কুমারী, অনিমা ভট্টাচার্য
সুমিত্রা, সর্বেশ্বর, মিস চায়না

১৯৬৮র শ্রেষ্ঠ অভিনেতা 'শিল্পী' পুরস্কারপ্রাপ্ত 'নায়ক' খ্যাত
জয়ন্তকুমার
ও
কমেডির নট
অভয় হালদার
আবহ সংগীত : সুধীর মণ্ডল, কার্তিক দে, অশ্বিনী ... রমণী ...
... অশোক চক্রবর্তী
আলোক নির্দেশনায়
বাদল চক্রবর্তী

পরিচালক : অভয় সাহা,
ম্যানেজার : বিশ্বপ্রসাদ ...
ব্যবস্থাপক : কালীজীবন ঘোষ
পৃষ্ঠপোষক : রঞ্জন মণ্ডল, হরিপদ কর্মকার
সত্বাধিকারী
হৃষিকেশ মিত্র
কার্যালয়
৩৩/১ রবীন্দ্র সরণী, কলিঃ ৬
ফোন : ৫৫-৭২৫২

---

৮৩ বছরের
ঐতিহ্যবাহী
সত্যম্বর অপেরা
নিবেদিত

সত্যপ্রকাশ দত্তের
কাচের স্বর্গ

'কলকাতার হ্যামলেট' খ্যাত অনিল বসু রচিত, পরিচালিত

...

শৈলেশ গুহ নিয়োগী রচিত পরিচালিত
...

এক দিন রাত্রে

অভিনয়ে
... কুমার/মীনাক্ষী দে
শ্যামসুন্দর/অশোক ভট্টাচার্য
মাখন মজুমদার
রবীন মজুমদার
অশোক চক্রঃ/তপনকুমার
অমিয় রায়
অনিল ভাদুড়ী
... মুখো/ যশোদা চক্রঃ
রেখা ভট্টাঃ/মায়া চক্রবর্তী
সুস্মিতা চক্রবর্তী
অরবিন্দ মুখার্জী (গাইয়ে)
এবং
অনিল বসু ও
... চ্যাটার্জি
ম্যানেজার : নিরঞ্জন সাহা
পরিচালক
বিমান ঘোষ
কার্যালয়
৩৩/৩ রবীন্দ্র সরণী কলি-৬
ফোন : ৫৫৮১১০
সর্বাধিনায়ক : অখিল সাহা

তপোবন
নিবেদিত

কমলেশ ব্যানার্জীর
দুঃস্বপ্নের রাত্রি

প্রশান্ত ভট্টাচার্যের
কুমারী কন্যা

রবীন ব্যানার্জীর
...

অন্যান্য ভূমিকায় : [illegible]

সুরশিল্পী:
দুলাল চট্টোপাধ্যায়
উপদেষ্টা:
নীলমণি দে
সর্বাধিনায়ক:
জহর চট্টোপাধ্যায়
প্রোপ্রাইটর:
মণীন্দ্র গোস্বামী

ফোন—
৫৫৩০০১
৩২/৩এ রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা ৬

নতুন ... অভিনীত
নূতন ...
বৈকুণ্ঠের উইল
প্রেরণায়
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৩, রবীন্দ্র সরণী

অনামিকা
যাত্রা ইউনিট
নিবেদিত

অমিয়কুমারের
মল্লিকা
সুর
গোপাল মল্লিক
কথা
বীরেশ্বর ভট্টাচার্য
নেপথ্য কণ্ঠে
যাত্রায়
এই প্রথম
হেমলতা (বম্বে)

রবীন ব্যানার্জির
সন্ন্যাসী রাজা
দিলীপকুমার

দিন যাত্রার বিজ্ঞাপনের পাতার সংখ্যাও। প্রথম রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপা হয় নট্ট কোম্পানির ১৯৮০-র দশকে। রথের দিন খবরের কাগজের পাতা খুললে যাত্রার বিজ্ঞাপনের রমরমা চলেছিল গত শতকের শেষ অবধি। এই শতকের প্রথম দশকে থেকেই সে জোয়ার ধীরে-ধীরে স্তিমিত হয় বিনোদন দূরদর্শন ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের কারণে সহজলভ্য হওয়ার কারণে। বর্তমানে গ্রাম-ঘরে হাতে-হাতে মুঠোফোন চলে আসার পর বোতাম টিপে শোনা যায় গান, দেখা যায় সিনেমা-সিরিয়াল-খেলা... আরও কত কী! এই পরিস্থিতিতে টিমটিম করে চলতে থাকা যাত্রাসংস্কৃতির ভরসা বেশ কিছু সরকারি-বেসরকারি উৎসব।

তাই বলে সমাজজীবনে যাত্রার ভূমিকার কথা ভুলে গেলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কাহিনি অবলম্বনে রচিত যাত্রাপালাও তার সর্বজনপ্রিয় অসাম্প্রদায়িক রূপ ধরে রেখেছে আগাগোড়া। পরবর্তীতে হরপ্পার অন্য কোনো পুস্তিকায় বিশদ আলোচনার ইচ্ছা রইল। যাত্রার ইতিহাসে সামাজিক পালার মধ্যে সরাসরি রাজনৈতিক পালাও তৈরি হয়েছে স্বাধীনতা-পূর্ব সময় থেকেই যা হয়তো আধুনিককালের লোকপুরাণ হিসেবে ভবিষ্য পুরাণে স্থান পাবে একদিন। সাতাত্তর সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার দু-এক বছর আগে নট্ট কোম্পানির একটি সুপারহিট সামাজিক যাত্রাপালা হয়েছিল 'মা মাটি মানুষ' নামে, লক্ষণীয় বিষয় বামফ্রন্ট সরকারের উৎখাতের ঠিক পূর্বের জমি আন্দোলনে মমতা ব্যানার্জি তাঁর স্লোগান তৈরি করেন ওই যাত্রার নামে—'মা মাটি মানুষ'! স্বাভাবিকভাবেই তখন লোক বা জনবিযুক্ত সিপিএম নেতারা গোটা বিষয়টিকে

সর্ব যুগের একটি নাম
নট্ট কোম্পানীর
অজস্র ধন্যবাদ!
১৩৮০ সালের পঃ বঃ সরকারের দেওয়া একমাত্র শ্রেষ্ঠ পালা হিসাবে পুরস্কৃত এবং একাদিক্রমে 8 বৎসর ধরে গ্রামে-গঞ্জে-শহরে অন্যূন ২৫,00000 লক্ষ দর্শককে মুগ্ধ করে সর্বকালের সর্বযুগের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করতে
৫00 রজনীর পথে
নটী বিনোদিনী
রচনা/ পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে
সঙ্গীত/ দুর্গা সেন
পরিচালনা/ অরুণ দাশগুপ্ত
মহাজাতি সদনে
প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬॥ টায়
প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬ টায়
এবং রবীন্দ্র সদনে ও কলামন্দিরে
নট্ট কোম্পানীর
নবতম আকর্ষণে
বিদ্যাসাগর
রচনা/ পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে
সঙ্গীত/ অনিল বাগচী
পরিচালনা/ অরুণ দাশগুপ্ত
খুব শীঘ্রই মহাজাতি সদনে মুক্তি পাচ্ছে
গত ২ বৎসর ধরে
নট্ট কোম্পানীর যে সামাজিক পালা লক্ষ লক্ষ দর্শককে মাতিয়ে রেখেছে আর যে পালার সব গান গুলিই সবার মুখে মুখে
ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের
মা মাটি মানুষ
সঙ্গীত/ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
পরিচালনা/ অরুণ দাশগুপ্ত
বিবিধ ভারতীতে নিয়মিত আকর্ষনীয় বেতার অনুষ্ঠান শুনুন
প্রতি রবিবার বেলা ১টা ১০তে নটী বিনোদিনী
প্রতি সোমবার রাত সাড়ে ন'টায় নটী বিনোদিনী
প্রতি শুক্রবার রাত সাড়ে ন টায় বিদ্যাসাগর
আগামী মরশুম ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন ২টি পালা
অচল পয়সা
সামাজিক
ঐতিহাসিক
মেহেরুন্নেসা
দ্রুত বুকিং চলছে
পরিবেশনায় সর্ব যুগের একটি নাম
নট্ট কোম্পানী
১৭, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৫
বিঃদ্রঃ - নটী বিনোদিনীর স্টেরিওফোনিক STERIO L.P. রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে এবং মা মাটি মানুষ-এর STERIO L.P. রেকর্ড পুজোয় বেরুচ্ছে
KAUSHIK ASSOCIATES

‘যাত্রাপালা’ বলে খিল্লি করেছিলেন, শুনেছি এখন ‘কন্যাশ্রী’-র নামেও যাত্রাপালা হয়—এই কথাগুলো বলবার কারণ প্রকৃত জনগণের বা লোক-ইতিহাস লিখতে হলে যাত্রাপালা দিকে আরও অনেক সন্ধানী দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল, যা আমরা হাবেভাবে শহুরে শিক্ষিতরা নাক সিঁটকে এড়িয়ে গেছি, অথচ থার্ড-থিয়েটার, পথনাটিকাকে জনসংযোগের বা গণচেতনা বৃদ্ধির হাতিয়ার ভেবেছি। এ বছর লকডাউন ও আমফান বিধ্বস্ত সময়ে থিয়েটার, সিনেমা জলসা, যাত্রা সকলের একই হাল। সবার ভরসা ইন্টারনেট, ইউটিউব বিশেষ করে। সেখানে সিনেমা থিয়েটার উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাথে ‘লোক’-যাত্রা পাল্লা দিয়ে চলে ভিউয়ার নাম্বারে! কিন্তু বিজ্ঞাপন তো দেয় পেশাদার দলগুলি, আর তাই এবছর ১৪২৭ সনে সংবাদপত্রের পাতায় রথের দিন যাত্রার বিজ্ঞাপন দেখাই গেল না। শুধুমাত্র ‘আজকাল’ পত্রিকার একটি পাতা জুড়ে যাত্রার বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে, ওই সংবাদপত্রের চারের পাতায় এই বিশেষ পরিস্থিতিতে যাত্রার সংকট নিয়ে অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তা যেন যাত্রাব্যবসার শোকপ্রস্তাব। আপাতত স্তব্ধ যাত্রাপাড়া।

এই প্রথম রথে যাত্রা স্তব্ধ চিৎপুরে

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পয়লা বৈশাখ যেমন বাঙালি ব্যবসায়ীদের হালখাতা, দুর্গাপুজোর যেমন মহালয়া, যাত্রাপাড়ার বোধন তেমনি রথযাত্রার দিন। আজ ক্যালেন্ডারে রথ এসেছে, কিন্তু যাত্রা স্তব্ধ চিৎপুরে। রথযাত্রার আগের দিন চিৎপুর জুড়ে সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। প্রতিটি দলের অফিসঘরের সামনে শোভা পায় আগামী পালার পোস্টার, ব্যানার। দূর-দুরান্ত থেকে নায়েকরা রথের দিন আসেন পালা বায়না করতে।

চিৎপুর যাত্রাপাড়ার সুপারস্টার জুটি অনল-কাকলির চলতি পালা 'নীড় ভাঙা ঝড়' স্তব্ধ হয়ে গেছে মার্চের মাঝামাঝি। সন্ধ্যাদীপ অপেরায় ছিলেন দুজনে। অনল-কাকলি বললেন, আমাদের পালার আগেই ১১৩ নাইট অভিনয় হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা তাকিয়ে থাকি মার্চ, এপ্রিল, মে-র দিকে। এই তিন মাসে প্রচুর অভিনয় হয়। তখনই লাভের মুখ দেখেন প্রযোজকরা। এবার সর্বনাশ হয়ে গেল।

অনল চক্রবর্তী বেশ কয়েকটি দলের হয়ে পালাও লেখেন। এবার তিনি 'অগ্রগামী'-তে। বললেন, পালার নাম তো জানুয়ারিতেই ঠিক করেছি— 'বিসর্জনের পরে'। পোস্টারও হয়ে গেছে। সরস্বতী পুজোর দিন পাঁচটা বুকিংও হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, একটা লাইনও লিখতে পারিনি। অথচ রথের দিনে অন্তত পনেরো-কুড়িটা ক্লাবের নায়েকরা এসে পালার বুকিং করেন। করোনা-বিসর্জন না হলে 'বিসর্জনের পরে' পালার কোনও সংলাপই বোধহয় লিখতে পারব না।

পোস্টার তৈরি হয়েছিল জানুয়ারিতে। সরস্বতী পুজোর আগে। এখন সবটাই অনিশ্চিত।

যাত্রা প্রযোজকদের সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের সভাপতি সমীর সেন তিন-তিনটে যাত্রা দলের মালিক। বললেন, আমাদের বিশ্বভারতী অপেরার এবার ২৫ বছর। টানা এতগুলো বছর চলার পর এই প্রথম আমার দলের অফিস বন্ধ থাকবে। বিশ্বভারতী ছাড়াও 'আনন্দভারতী', 'কলকাতা অপেরা'— কোনও দলেরই কিছু ঠিক হয়নি এখনও। পালা লেখা তো শুরুই হয়নি, দলই তৈরি হয়নি।

যাত্রাশিল্পীদের সংগঠন 'সংগ্রামী যাত্রা প্রহরী'র কর্ণধার, অভিনেত্রী রুমা দাশগুপ্ত বললেন, এমন মন-খারাপ-করা রথ কখনও আসেনি আমাদের যাত্রা-জীবনে। খুব ছোট করে বাগবাজারে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রামঞ্চে আমরা পুজো করব। ভেঙে পড়লে তো চলবে না। রুমা দাশগুপ্ত বললেন, বহু শিল্পী আজ অসহায়। মুখ্যমন্ত্রী পাশে আছেন। আমরাও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি শিল্পীদের পাশে থাকার।

যাত্রায় চার-পাঁচজন 'টপ' আর্টিস্ট বাদ দিলে অনেকেই আজ আনাজ বিক্রি করছেন, কেউ কেউ গ্রামের বাড়িতে গিয়ে চাষের কাজ করছেন! বললেন যাত্রার কর্মী ইউনিয়নের সভাপতি হারাধন রায়। বললেন, যাত্রাদলের কয়েকজন ম্যানেজার, কর্মী লকডাউনে চিৎপুরেই আটকে পড়েছিলেন। স্থানীয় কাউন্সিলর বিজয় উপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাঁদের জন্য চাল, ডাল, তেল, আলুর ব্যবস্থা করা হয়। এখন ফিরতে পেরেছেন।

১১ জুন ফণিভূষণ মঞ্চে যাত্রাদলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন যাত্রা আকাদেমির সভাপতি ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি যথাসাধ্য উদ্যোগ নিয়েছেন। যাত্রা আকাদেমির কার্যকরী কমিটির সদস্য, একাধিক যাত্রাদলের মালিক কনক ভট্টাচার্য বললেন, অরূপবাবু আবার আগস্টে আমাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। আমার 'সন্ধ্যাদীপ অপেরা' অনল-কাকলি-কে নিয়ে ১০০ রজনী পার করে দিয়েছে। আমাদের 'রত্নদীপ অপেরা'ও শো করেছে ৭৪টা। কিন্তু চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচুর শো হয় সব দলের। এই তিন মাসেই প্রযোজকরা লাভের মুখ দেখেন। ৬০/৬৫ থেকে এখন চিৎপুরে ৪০/৪৫টা দল এসে ঠেকেছে। ছোটখাট দলগুলো তো পুরোটাই লোকসান করে বসে আছে।

যাত্রাপাড়া স্তব্ধ বলে মনখারাপ গ্রামগঞ্জের বহু ক্লাবের। বছরে একবার তারা চিৎপুরের দল এনে বাৎসরিক বিনোদনের ব্যবস্থা করে এলাকাবাসীদের। টিভি সিরিয়ালের প্রবল প্রতিপত্তির যুগেও যাত্রা নিয়ে এখনও মাতোয়ারা হন হাজার হাজার গ্রামের মানুষ। রুমা দাশগুপ্ত বললেন, জানেন তো, আর একজনেরও মন খুব খারাপ আমাদের মতোই। তিনি হলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, যিনি শুধু যাত্রা অনুরাগীই নন, যাত্রা শিল্পীও। শ্রীচৈতন্য অপেরার চলতি বছরের পালা 'গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম'র 'গঙ্গা' রুমা দাশগুপ্ত বললেন, বর্ধমানে আমরা শো করতে গেলে উনি আমাদের পালায় শ্রীকৃষ্ণ-র পার্ট করেন। এতটাই উনি ভালবাসেন যাত্রাকে।

ষষ্ঠী থেকে জষ্ঠি— যাত্রাপাড়ার এই হিসেবটা গন্ডগোল করে দিয়েছে করোনা। আগস্ট মাসে আবার অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে যাত্রাপাড়ার বৈঠক। পালাকার অনল চক্রবর্তী বললেন, ইচ্ছে আছে, একটা পালা লিখব এবার, যার নাম দেব 'আমরা করব জয়'।

এই জয়ের দিকে তাকিয়ে শুধু চিৎপুর পাড়া নয়, সারা বাংলার অগণিত যাত্রার দর্শক।

অনুষ্কা ও অঙ্কুশ এবং তাপস তানিয়া
অভিনীত
১৪২৭ সালে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টিকারী যাত্রাপালা!
মাঠে মাতঙ্গিনী কাজে বাঘিনী
রচনা / নির্দেশনা তপন চ্যাটার্জী
নীল নীলাশা
সায়ন
রাজকুমার। কুমার অর্পণ। দিলীপ কুমার
কবিতা রাণী ও প্রভঞ্জন বাবু
উমা অপেরা
ফোন ৯৭৭৫২০৩৭৬৩ • ৯৪৭৪২০৮৪১২৩

১৪২৭ সালে কল্যাণী অপেরার হাইটেক যাত্রাপালা!
সেখ নুর হোসেন প্রতিষ্ঠিত
আর. পি. প্রযোজিত
মানিক এণ্ড ব্রাদার্স প্রচারিত
তাপসী (মুন)
দেবপ্রতিম
প্রবাল ব্যানার্জী
মিস্ মৌসুমী
মিস্ মিঠু রাণী
প্রবীর কুমার
অভিনীত
ডিজিটাল লাইট ও সাউণ্ডে সামাজিক যাত্রাপালা!
কালীর ভক্ত কালীর মীরজাফর
রচনা প্রবাল ব্যানার্জী নির্দেশনা তপন চ্যাটার্জী
শ্রী শ্যামল ধাড়া
শ্রী রবীন্দ্রনাথ সামন্ত এবং
শ্রী কালীপদ অধিকারী
কল্যাণী অপেরা

॥ রাধাকৃষ্ণ সহায় ॥ নমঃ নটনাথায় নমঃ
১৪২৭ সালে এক মর্মস্পর্শী সামাজিক যাত্রাপালা!
কোকিল মনি প্রতিষ্ঠিত
সুমনা ও বিদিশা প্রযোজিত
উপদেষ্টা মান্তু অধিকারী ও
অলক প্রামাণিক
সপ্তপর্ণা
জয়ন্ত কুমার
মৌমিতা
ক্যামিলা
অভিনীত
নির্যাতিতা বধূ নীরবে কাঁদে
তাইতো নারী জাগরণের ঢেউ
প্রতিবাদী হয়ে ত্রিশূল হাতে.....
এবার—
গাঁয়ে আসছে ছোট বউ
রচনা / নির্দেশনা
বাবলী ভট্টাচার্য্য
কুমার নটবর
কনক কুমার। পুতুল নস্কর। জগবন্ধু বাবু। দীপ কুমার
রূপকথা। মেঘনাদ পড়িয়া
বুলবুল মহান্তী
কুমার বিশ্বজিৎ
শুভশ্রী অপেরা
দলপরিচালক জয়ন্ত মাইতি ৯৭৩২৮৬২৪৫০ • ম্যানেজার প্রসাদ ৮০০১৮৮৯৪৮৪
৩৭৫ রবীন্দ্র সরণী. কলকাতা ৭০০০০৫ ফোন ৯৭৭৫১২৯৩১০/৯৭৩৪৩৭৭৫৮৭

প্রকাশিত